# সাহসিকতা

Sushobhan Rafi

সম্পাদক ঃ তরুণকুমার সরখেল

সম্বিত্তা • সম্পাদক ঃ তরুণকমার সরখেল • ২২ বর্ষ, সেপ্টেম্বর ২০১৬ • শারদ সংখ্যা ১৪২৩

পুরুলিয়া শহর থেকে প্রকাশিত একমাত্র ছোটদের পত্রিকা

ছোটদের পূজাবার্ষিকী ১৪২৩ | ২২ বর্ষ, অক্টোবর ২০১৬

# সাঁকো

সম্পাদক
**তরুণকুমার সরখেল**
মুক্তাঙ্গন
উত্তর আমডিহা, ডাক- দুলমি নডিহা
জেলা- পুরুলিয়া, ৭২৩১০২
e-mail:
sarkheltarun126@gmail.com
মোবাইল নং ঃ ৮৫৩৭৯০১২৪০

**নামাঙ্কন**
দিগম্বর দাশগুপ্ত

**অলংকরণ**
অবি সরকার ও প্রণব হোড়

**প্রচ্ছদ**
সৈয়দ সুশোভন রফি

মুদ্রণ সহযোগিতায়
রাজেশ রেওয়ানী
বাবা লোকনাথ কম্পিউটার অ্যান্ড
অফসেট প্রিন্টিং মঠ
বি টি সরকার রোড, পুরুলিয়া
(৯৪৭৫৩২৪৪৭৪)

মূল্যঃ ২৫ টাকা

## প্রিয় আমার ছোট্ট বন্ধুরা,

*এসে গেল ছোটদের পত্রিকা সঞ্চিতার পুজো সংখ্যা। বন্ধুরা তোমরা হয়ত জানো যে, ছোটদের এই নির্ভেজাল পত্রিকাটি পুরুলিয়া শহরের একমাত্র ছোটদের পত্রিকা। এই জেলা থেকে আরো যে দু'তিনটি ছোটদের পত্রিকা প্রকাশিত হয় সেগুলির মধ্যে সবার প্রথম সারিতে রয়েছে টুকলু পত্রিকা। এছাড়া রয়েছে কেকা, রূপকথা, পলাশ প্রভৃতি। অর্থাৎ মাত্র হাতে গোনা কয়েকটি ছোটদের পত্রিকা বছরে একবার অথবা দু'বার বেরোয়।*

*তাই তোমরা যারা ক্ষুদে পাঠক তারা নিশ্চয়ই পুজো সংখ্যা প্রকাশের অপেক্ষায় ছিলে। এই সংখ্যায় তোমাদের জন্য রইল অনেকগুলো গল্প। বেশ কয়েকটি ভূতের গল্পও রয়েছে। এছাড়া ছড়া-কবিতা-লিমেরিক ও খেলার পাতাও সাজিয়ে দিয়েছি।*

*আমাদের সবার অত্যন্ত প্রিয় ও পরিচিত শিল্পী সৈয়দ সুশোভন রফি সঞ্চিতার জন্য প্রচ্ছদ করে দিয়েছেন। কেমন লাগল সঞ্চিতার প্রচ্ছদ ও অন্যান্য লেখা তা আমাদের চিঠি লেখো অথবা মেইল করে জানিও।*

*সবাই ভালো থেকো। পুজোর আনন্দে মেতে ওঠো। বন্ধুদের নিয়ে খুব হৈ চৈ করো।*

*—তোমাদের সম্পাদক বন্ধু*

## সূচিপত্র

**গল্প**

✷ শিশির বিশ্বাস-১২, জন পূততুণ্ড -৭২, সুদীপ্ত মণ্ডল-৭০, সুনির্মল চক্রবর্তী-১৬, অবি সরকার-১৯, অনন্যা দাশ-২২, সাগরিকা রায়-২৫, শুভ্রা ভট্টাচার্য-২৮, প্রণব হোড়-৩১।

**ছড়া, কবিতা ও লিমেরিক**

✷ ভবানীপ্রসাদ মজুমদার অপূর্বকুমার কুণ্ডু জগদীশচন্দ্র সরখেল পঞ্চানন মালাকর-৫, অচিন্ত্য সুরাল মোহম্মদ আলী বুলবুল কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়-৪, পবিত্র সরকার অপূর্ব দত্ত প্রবীর জানা শীতল চট্টোপাধ্যায় সুনীতি মুখোপাধ্যায়-৬, সুখেন্দু মজুমদার দিগম্বর দাশগুপ্ত দীপ মুখোপাধ্যায়-৭।

**দীর্ঘ কবিতা**

✷ অমিয়কুমার সেনগুপ্ত দেবাশিস দন্ড -৮, দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য -৯, সতীশ বিশ্বাস-৪৬।

**ছড়া, কবিতা ও লিমেরিক**
✷সোমনাথ ভট্টাচার্য মানস সরকার উত্থানপদ বিজলী বিধান সাহা বিজন দাস অসীম আচার্য-১০, উৎপলকুমার ধারা দুর্গাদাস পাল রণজিৎ হালদার-১১, প্রবীরকুমার সামন্ত সুপর্ণা ভৌমিক চক্রবর্তী-১৭, মহাশ্বেতা রায়-২১।

**ছোটদের পাতা**
✷ঈলিতা চট্টোপাধ্যায় সোহিনী নন্দী অনমিত্র দেওঘরিয়া তনুব্রত সরখেল - ১৮।

**বাংলাদেশের ছড়া, কবিতা ও গল্প**
✷মঈন মুরসালিন নাসিরুদ্দীন তুসী জসীম মেহবুব-৪২, খন্দকার মাহমুদুল হাসান -৪৩, আসলাম সানী ইমরান পরশ নীহার মোশারফ-৪৪।

**ছড়া, কবিতা ও লিমেরিক**
✷বিপ্লব গঙ্গোপধ্যায় সুপ্রকাশ আচার্য অংশুমান চক্রবর্তী তপোন দাশ উপাসনা পুরকায়স্থ -২৭, স্মৃতিকণা মুখোপাধ্যায়-৩০, বিকাশচন্দ্র দাস-৩২।

**ছোটদের নাটক**
✷শুভজিৎ বরকন্দাজ-৩৩।

**ছড়া, কবিতা ও লিমেরিক**
✷পার্থ সিন্‌হা ষষ্ঠীপদ পাল -৩৭, ভাগ্যধর হাজারী গোপাল কুম্ভকার মালিপাখি-৪১, শ্যামাচরণ কর্মকার রামচন্দ্র ধাড়া সুকান্ত ঘোষ শঙ্করকুমার চক্রবর্তী অরুণ মণ্ডল- ৪৫, বসুন্ধরা মাজি মৃত্যুঞ্জয় কুণ্ডু -৪৮, বিকাশ পণ্ডিত শান্তিরঞ্জন চক্রবর্তী কাজী শাহাদাত আলী সুভাষ মুখোপাধ্যায় অজয় বিশ্বাস নিখিলরঞ্জন চক্রবর্তী -৪৯, অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-১১।

**গল্প**
✷সুমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-৩৮, সৌম্যনারায়ণ আচার্য -৫১, সৈয়দ রেজাউল করিম-৫৮, সঞ্জয় মিত্র -৬৩, মনোরঞ্জন গরাই-৬৭, সুচিত চক্রবর্তী-৬৯, দেবদুলাল কুণ্ডু-৭৫, সমাজ বসু-৭৮, তরুণকুমার সরখেল-৮৩।

**নিবন্ধ**
✷শীলা সরকার-৫০।

**ছড়া, কবিতা ও লিমেরিক**
✷সুজিতকুমার পাত্র-৫২, শীলা মুখোপাধ্যায় কাজল দাস প্রদীপকুমার রায় তপনকুমার দাস-৫৩, নীতীশ চৌধুরী মহাবীর নন্দী লালমোহন ভট্টাচার্য তরুণ বাউরি দীনেশচন্দ্র আচার্য -৫৬, বদ্রীনাথ পাল জগদীশ মণ্ডল উদয়ন হাজরা অঙ্কিতা আচার্য সতীরঞ্জন আদক-৫৭, সমরকুমার চট্টোপাধ্যায় পরিমল ঘোষ-৬২, বিধান শীল বাপ্পাদিত্য পাণ্ডে-৬৮, অনিতা অধিকারী অশ্রুরঞ্জন চক্রবর্তী -৭১, নুরজামান শাহ-৭৭

**খেলা**
✷অমল ত্রিবেদী-৫৪।

**ছড়া, কবিতা ও লিমেরিক**
✷শেখ গোলাম মাবুদ স্বপন বসু মল্লিক তাপস চক্রবর্তী নয়নতারা তন্তুবায় ব্রজেন্দ্রনাথ ধর-৮০, চৈতালি মজুমদার স্নেহাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায় স্বপনকুমার বিজলী নীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত সুদীপ্ত বিশ্বাস সৌমিত্র মজুমদার-৮১, দীপকচন্দ্র চক্রবর্তী নিতাইচন্দ্র রজক বিষ্ণু সামন্ত সুশান্ত তেওয়ারী মদন চক্রবর্তী প্রদীপ চৌধুরী সুদীপ চৌধুরী -৮২, মানস দরিপা-৮৫, রাজীব মিত্র সলিল মিত্র সুচন্দ্রনাথ দাস সলিলরঞ্জন দাশগুপ্ত-৭৯, নূপুর সরখেল-৮৬।

**ছোটদের বই**
✷ছোটদের গল্প-কবিতা ও
ছড়ার বই-এর আলোচনা-৮৭ ও ৮৮।

সঞ্চিতার সমস্ত পাঠক-পাঠিকাদের জন্য রইল আমাদের অগ্রিম শারদ শুভেচ্ছা। সবাই ভালো থাকুন।

## তোর পুজো, আমার পূজা

**অচিন্ত্য সুরাল**

তুই বলছিস তোদের পুজোয়
থিমের উপর জোর ;
আমার কাশের থিমে শুধুই
শিউলিঝরা ভোর।
গর্ব করিস মন্ডপে তোর
হাজার কারুকাজ
এবং বলিস আমার পূজায়
নেই বাহারি সাজ।

তুই ভাবছিস তোর পুজোতে
নানান রঙিন আলো ;
আমার পূজার দালান নাকি
রাত ঘনালেই কালো।
তোদের পুজোয় চপ কাটলেট
বিরিয়ানির হাঁড়ি ;
আমার নাকী সেই সাবেকি
মিষ্টি রকমারি।

অনেক কথার খই ফোটালি
এত যে কথার খই,
বল দেখি তোর দুগ্‌গা পুজোয়
দুর্গাঠাকুর কই !
তোদের পুজোয় হট্টগোল আর
আদেখলেপনা।
আমার পুজোয় ভাবগম্ভীর
মাতৃ আরাধনা।

## আসছে পুজো

**মোহম্মদ আলী বুলবুল**

আর দেরি নেই ওই যে ফোটে শিউলি ফুলের রাশি
টগর চাঁপা গোলাপ গাঁদা ফুটছে পাশাপাশি।
গ্রাম শহরে পুজোর বাঁশি কাশের বনে ঢেউ
আগমনির চরণ ধ্বনি আসছে বুঝি কেউ ?
দিঘির জলে পদ্ম ফোটে মনটা মাতোয়ারা
আসছে পুজো পুজোর ছুটি খুশি বাঁধন হারা।

## আগমনি

**কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়**

তাক-কুড়াকুড়, তাক- কুড়াকুড়
ওই শোনা যায় ঢাক-গুড়াগুড়
চাদ্দিকেতে মিষ্টি-মধুর
বাজছে পুজোর ঢাক।
ঘন্টা বাজে, কাঁসর বাজে, বাজে রে জোর শাঁখ।

তাক-কুড়াকুড়, তাক- কুড়াকুড়
আয় চলে মা দুগ্‌গাঠাকুর
জন্ম দে মা দৈত্য-অসুর
হাজার-কোটি-লাখ।
ঘন্টা বাজে, কাঁসর বাজে, বাজে রে জোর শাঁখ।

তাক-কুড়াকুড়, তাক- কুড়াকুড়
উঠছে রে দিক-দিগন্তে সুর —
অন্নবস্ত্র দে করে দূর
অস্ত্রশস্ত্র থাক।
ঘন্টা বাজে, কাঁসর বাজে, বাজেরে জোর শাঁখ।

তাক-কুড়াকুড়, তাক- কুড়াকুড়
সঙ্গ দে মা চোর ও ডাকু-র,
শান্ দিয়ে ওই শক্ত চাকুর
রক্ত মাথায় মাখ।
ঘন্টা বাজে, কাঁসর বাজে, বাজে রে জোর শাঁখ।

## বৃষ্টি ঝরে যাক

**অপূর্বকুমার কুন্ডু**

কাঠফাটা রোদ, মাঠটা ছিল গাছের ছায়ায় শুয়ে,
ইচ্ছেটা তার দিক নিবিয়ে সূর্যটা এক ফুঁয়ে।

এদিক ওদিক কেউ নেই আর এখন চতুর্দিকে,
আকাশ জুড়ে মেঘ রেখেছে আগুন চিঠি লিখে।

খুঁটোয় বাঁধা তিনটে গরু আধ বোজা চোখ গুলো,
ছটফটিয়ে তাড়ায় মাছি উড়ছে খুরে ধুলো।

ঢোলকলমীর ফুলটা ঘিরে একটা ফড়িং ওড়ে,
ভয় পেয়ে মেঘ আকাশ থেকে গেছে এখন সরে।

বিকেল নামুক-সন্ধে নামুক, আকাশ ঢাকুক মেঘে,
গাছের পাতা উঠুক দুলে ঝোড়ো বাতাস লেগে।

মাঠের বুকে টাপুর টুপুর বিষ্টি ঝরে যাক,
কাঠফাটা শীতের জন্যে না হয় তোলা থাক।

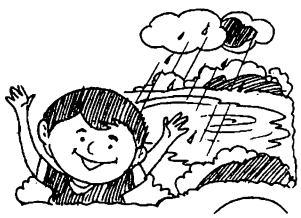

## শ্রাবণে

**জগদীশচন্দ্র সরখেল**

রিম ঝিম ঝিম বাদল ধারা ঝরছে দিনে রাতে,
পাগল পাগল মেঘের খেলা দেখছি জানালাতে।
সোঁ-সোঁ-সোঁ হাওয়ার তালে নাচছে সকল গাছ
ছিপছিপে ভীম নেড়া মাথায় ধরছে ছিপে মাছ।
টুর্ টুর্ টুর্ গ্যাঙর গ্যাঙ ব্যাঙেরা গায় গান,
কাজল কাজল সাঁঝ বেলাতে ঝিল্লী তোলে তান।
ছপ ছপা ছপ চলছে কৃষক, মাঠ ভর ভর জলে
গুড্ গুড্ গুড্ মেঘের দাপট বিজলী ওঠে জ্বলে।
ঘুম ঘুম ঘুম চড়াই দুটো বাসায় আরাম করে
দুষ্টু খোকন দুষ্টুমিতে এ-ঘর ও-ঘর করে।

## বর্ষা

**ভবানীপ্রসাদ মজুমদার**

| | | |
|---|---|---|
| ছুড়ে মারে | কৃষ্টির বর্শা | বৃষ্টির |
| প্রাণহীন | পৃথিবীতে ভরসা, | জেগে ওঠে |
| দুঃখের | কালো-রাত ফর্সা, | ধুয়ে-মুছে |
| বর্ষা | বর্শা | ভরসা। |
| খুশি-খেয়া | বেয়ে বেয়ে করবী, | জুঁই-বেল |
| সৌরভে | গৌরবে গরবী, | মৌ-রবে |
| তাল-কলা | আনারস মন্দ ? | কাঁঠালও কি |
| রথে-পথে | মেতে ওঠে ছন্দ, | জীবনের |

তাই মহানন্দ, পাই মহানন্দ
নেই কোন সন্দ, ধোঁকা ধাঁধা-ধন্দ !

## বৃষ্টি দিনের ইচ্ছে

**পঞ্চানন মালাকর**

বৃষ্টি ঝরে ঝম ঝমা ঝম বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপ,
কাজলা দিঘির কালো জলে পানকৌড়ি দিচ্ছে ডুব।
আকাশ জুড়ে বাদলা মেঘে যখন তখন নামায় ঢল,
স্কুলে যাওয়া হবে না তাই পড়াশোনা সব বিফল।
ঘরে বসেই কাটাচ্ছি দিন বাইরে অঝোর বৃষ্টি ধারা,
পাগলা বাতাস আসছে ছুটে খুশিতে আজ বাঁধনহারা।
এমন দিনেই ইচ্ছে করে যাই ছুটে দূর বাইরে মাঠে,
মনের সুখে ভিজতে থাকি ঝির ঝিরে ওই বৃষ্টি ছাটে।

## ঘোড়াদের হাসি
### পবিত্র সরকার

কেষ্টদাসের জ্যেষ্ঠতাত কর্ম করেন উচ্চ —
ঘোড়ার গায়ে মালিশ করেন, পালিশ করেন পুচ্ছ।
সেই আরামে, সেই আবেশে,
ঘোড়ারা সব মুচকি হেসে,
বলে, মানুষ করছে সেবা, ব্যাপার কেমন বুঝছ !

## দুর্মুখ
### অপূর্ব দত্ত

মানুষটি বেশ রসিক, তবে নিতান্ত দুর্মুখ,
কেউ বলে খুব বুদ্ধিদীপ্ত, কেউ বলে উজবুক।
কাউকেই সে দেয় না রেহাই
শ্বশুর-জামাই, বেয়ান-বেয়াই,
পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙতে করেন না ভুলচুক।

## বন্ধু সবাই
### প্রবীর জানা

বলল মেঘ বাতাসরে তোর শরীর হালকা তুলো,
নাই গায়ে জোর আমার মতো উড়াস কেবল ধুলো !
উড়তে উড়তে আকাশ মাঝে বলল একটা শালিক,
নয় শুধু আকাশ যাই যেথা আমি হই তার মালিক !
বলল বাতাস যাচ্ছি চলে থাক তোরা তবে একা,
পাচ্ছি দুঃখ তোদের সাথে হবে না আর দেখা !
বলল শালিক দে মেঘ জল পাচ্ছে জল তেষ্টা,
বাঁচবনা আর কষ্ট শ্বাসের করি যতই চেষ্টা !
বলল মেঘ বাতাস ছাড়া বাঁচবেনা কেউ আর,
বন্ধু সবাই মিলেমিশে থাকা যে দরকার !
হাসছে বাতাস ফিসফিসিয়ে বলছে সে বারবার,
সাজে কী রাগ বন্ধু আমি হয়তো ভুল সবার !
গরগরিয়ে হাসল মেঘ বৃষ্টি সাথে হাওয়া,
শালিক তখন ফিরে বাসায় করল নাওয়া খাওয়া !

## আকাশের গায়ে
### শীতল চট্টোপাধ্যায়

আকাশের গায়ে ভেসে ওঠে ওরা
সূর্য, চাঁদ ও তারা,
তারই গায়ে আসে সকাল সন্ধে
পেরিয়ে চলার ধারা।

কখনো আবার রামধনু ডোরা
গ্রহণে সূর্য আধা,
রাতের আকাশে ধুমকেতু হাঁটে
উল্কা খসার ধাঁ-ধাঁ।

আকাশের আছে সব দেখা চোখ
নীচে চেয়ে সারাক্ষণ,
আকাশ সীমাকে ছাড়িয়ে কোথাও
পালাতে পারেনা মন।

## কা'র দোষ
### সুনীতি মুখোপাধ্যায়

কিল-চড় আর ঘুসি,
ওরা কিন্তু ওদের কাজে
নয়তো আদৌ খুশি।
কিল-চড় দুই ভাই,
ঘুসি ওদের বোন,
দুই দাদাকে সেদিন ডেকে
বললে, "তোরা শোন,
আমরা ওসব মারব না আর
হয় বড় আপশোশ"।
চড় বললে, "ভাবিস কেন ?
ও তো হাতের দোষ।"
এমন সময় লাথি এসে
বললে, "ও কিল-চড়,
শুধু তোদের কথাই ভাবিস,
আমার কথাও ধর।"
কিল আর চড় বললে, "লাথি
তোর কীসে দোষ তা ?
নামটা লাথি হলেও তা'তে
দোষের ভাগী পা।"

## হারিয়ে পাওয়া

**সুখেন্দু মজুমদার**

তোমার জন্য কাঁদতে পারি চোখের জলে থাক ভেসে
উজাড় করা মনের কথা বলার আগে যায় ভেসে
শুনলে যারা হাসছে হাসুক
ইচ্ছে যেমন ভাসছে ভাসুক
এই তো আছে ওই দেখি নেই গেছে যখন সব ভেসে
অন্ধকারের ভাঙা গড়ায় হাজির তুমি ঠিক ভেসে।

তোমার জন্য ছেড়ে এলাম চেনা পথের সব কিছু
চেনা সুরের গান ভুলেছি এটা এমন নয় কিছু
রোদ নামেনা পাড়ায় পাড়ায়
রং ছিল যা সে সব হারায়
বেভুল পথে ঝিলিক মারে ছড়িয়ে রাখা রং কিছু
হারিয়ে ফেলা কথামালাও দিক ফিরিয়ে তার কিছু।

## যোগ্য প্রাপক

**দিগম্বর দাশগুপ্ত**

ক্লাসে ঢুকে বাংলার স্যার গেলেন দেখে থমকে
দুই ছাত্রের ঝগড়া সে কী ! থামিয়ে তাদের ধমকে
বলেন "এসব হচ্ছেটা কী ? ক্লাসেতে বাঁদারামি।"
এক ছাত্র বললে, "ইস্কুলে আসার পথে আমি -
শ'টাকার এক নোট কুড়িয়ে, পেলে ইন্দ্রনীল
এবং আমার মধ্যেতে হয় এমনি এক ডিল।
মিথ্যে কথা বলতে বেশি পারবে যে সব থেকে,
তার কাছেতেই তৃতীয় কেউ নোটটা দেবে রেখে।"
স্যার শুনে কন, "ছি ছি ছি ছি মিথ্যে বলা নিয়ে
এই বয়সে কম্পিটিশন ? ভাবছি কোথায় গিয়ে —
পৌঁছেছো সব। আমরা যখন এই বয়সের ছেলে
মিথ্যে কাকে বলে সেটাই ছিল না আক্কেলে
বলা তো কোন দূরের কথা," স্যারের কথায় তাঁকে
ছাত্র দু'জন বললে তখন "টাকাটা আপনাকে —
চাই দিতে স্যার,আপনারই তা প্রাপ্য বলে মানি"
বলেই তারা স্যারের হাতে দেয় তুলে নোটখানি।

## যে যার মতো

**দীপ মুখোপাধ্যায়**

মেখেছি রোদ সকালে
উঠেছি গাছের ডালে
দেখিনি লোক দ্বিতীয়
ফাঁকা বেশ রাস্তাটিও।
পাখিরা ঝগড়া করে
আড়ালে অবান্তরে
সেখানে পাতার ফাঁকে
ছায়াটা ভাঙতে থাকে।
সোনালি ধানের ক্ষেতে
কিছুটা এগিয়ে যেতে
বাতাসে ফড়িং ওড়ে
রেখেছি নেকনজরে।
পুকুরে শ্যাওলাজলে
সমানে সুজ্জি গলে
দু'চোখে দেখছি খালি
সাজানো গেরস্থালি।
মায়াবী দৃশ্য যত
রয়েছে যে যার মতো
খুশিতে কলকলাতে
ছুঁয়েছি নিজের হাতে।
এখানে বৃষ্টি ভিজে
করেছি দুষ্টুমি যে
দেখেছে ঝুমকোলতা
গোপণে থাক সে কথা।

## মাছরাঙা আর পানকৌড়ির গল্প

### অমিয়কুমার সেনগুপ্ত

মাছরাঙাটির ইচ্ছে হলো পানকৌড়ির সাথে
ফুল পাতাবে, হাত মেলাবে সকাল ন'টায় হাতে।
ডুব দেবে সে জলের ভেতর, উঠবে আবার ভেসে...
জানিয়ে এলো সাতসকালেই দৌড়ে ঘরে এসে।

তারপরে সে মাঝপুকুরের লাল শালুকের পাশে
চুপটি করে রইলো বসে পানকৌড়ির আশে।
ভাসতে-ভাসতে পানকৌড়ি যখন এলো কাছে
মাছরাঙাটি বলল তাকে "একটা কথা আছে।
শুনতে হবে, মুখ ফিরিয়ে আজ যেয়ো না চলে —
তোমার সঙ্গে ফুল পাতাবো শালুক গাছের তলে।
সাক্ষী থাকুক রোদ ও হাওয়া, জলমোরগের ছানা;
সাক্ষী থাকুক পুকুরজলের দল-শ্যাওলার পানা।
মাছ খাবো না। তোমার মতন উঠবো -ডুববো জলে—
বকের দেখে হিংসে হবে; নীল আকাশের তলে
চিল ভেসে যায়, দেখলে হবে একটুকু মনমরা —
বলবো আমি ওদের: মিছেই হিংসে করিস তোরা

পানকৌড়ি শুনলো সবই। বললো "ওগো সখা
আমার তুমি বন্ধু হলে বলবে সবাই বোকা
তুমিই বরং এই পুকুরের হও রাজা। জল থেকে
সব মাছেদের বলবো আমি তখন ডেকে-ডেকে
আর ভয় নেই। এখন থেকে মাছরাঙা ওই পাখি
তোদের বন্ধু। হাত পাত্ সব, দিক পরিয়ে রাখি।
ওই তো তোদের দুঃসময়ের জন্যে আসবে কাছে।"
একটি শকুন দেখছিলো সব পুকুরপাড়ের গাছে।

ছোঁ মেরে সেই মাছরাঙাটার গলায় জাপটে ধরে'
বসলো গিয়ে আবার শকুন গাছের শাখার 'পরে।
ডুব দিলো সেই পানকৌড়ি। উঠলো না আর ভেসে।
জল শুকিয়ে পুকুর তখন মাঠ হয়ে যায় শেষে।

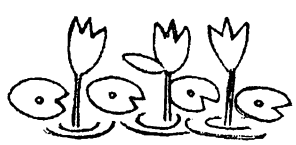

## তাই ভাবি খাতির কেন

### দেবাশিস দন্ড

আয় আয় তু তু মুখে ওঠে থুতু
দিদা তবু জানে নাকো থামতে।
মাঝে মাঝে ফাঁকে ফাঁকে মিঁয়াও মিঁয়াও ডাকে
সিঁড়ি দিয়ে উঠতে ও নামতে
জীবন ওষ্ঠাগত দাদু খায় থতমত
দিদিমার তবু দেখি থামা নেই।
ভীষণ করুণ মুখে মামি কাঁদে ঠুকে ঠুকে
দরজাটা খোলা আছে, মামা নেই।
এম বি বি এসে এসে মেডিসিন দিল ঠেসে
দিদা তবু ডাকে ফুল ফোর্সে।
ক্যাটাক্যাটক্রাইসিসি দাও মুখে ফ্রাই ফিস
ওঝা বলে — গুঁজে দাও সর্ষে।
একদিন এল হুলো দিদা বলে — ওলো ওলো
চেয়ারটা টেনে ওকে বসা না।
কুলার চালিয়ে দে কাছুয়া জ্বালিয়ে দে
উঃ বাবা কী ভীষণ মশা না !
ও বৌমা, বৌমা গো চা-টা বসাও না গো
বেশি বেশি দুধ দিয়ে নাড়বে।
ব্রাটানিয়া বিস্কুট চানাচুর মুঠ মুঠ
ভরে দিও যতটুকু পারবে।
হুলো বলে — আঁও আঁও ব্যাপারটা বাতলাও
বড় বেশি খাতিরের ঘটা যে ?
দিদা বলে— নেংটিতে মারছে অশান্তিতে
কেটেকুটে দিল সবকটা যে।
এটা কাটে ওটা কাটে কুবুদ্ধি গাঁটে গাঁটে
লোপাট করছে যা যা রাখছি।
পাড়ায় সবাই জানে যায়নি তোমার কানে
এক মাস ধরে কত ডাকছি।

# দুই জাপানি

**দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য**

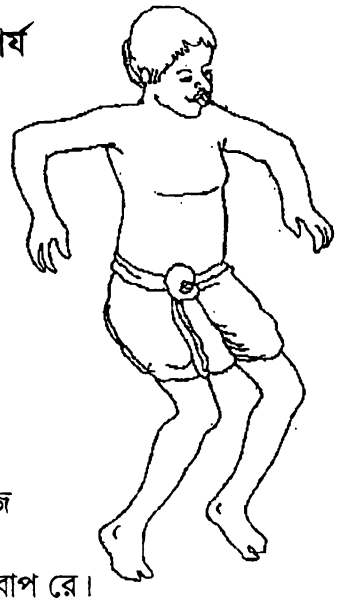

**জাপানি -১**

হিদেকুটি ওদোমুচি
মুখে দাড়ি তিন গুছি
একদিন রাত্রে
তেল মেখে গাত্রে
বলে তার পিতারে
যাব আমি সাঁতারে

পিতা হেঁকে কন আজ
কোর না এমন কাজ
কথা শোন হিদেকুটু বাপ রে।
ঝোড়ো হাওয়া তোলে ঢেউ
কাছে পিঠে নেই কেউ
সাগরের কী ভীষণ দাপ রে।
শুনলো না কথা সে
সেই ঝোড়ো বাতাসে
ঘর ছেড়ে চরে গিয়ে দাঁড়াল
শনশন বয় ঝড়
বাজ ডাকে কড়কড়
হিদেকুটি সাগরে পা বাড়ালো।
গায়ে এঁটে শামলা
পিঠে বেঁধে গামলা
ঝুপ করে ঝাঁপ দিলো সাগরে
আর উঠে এল না
কেউ খুঁজে পেল না
খেয়েছিলো তাকে বুঝি হাঙরে।

**জাপানি-২**

হাচিওজি থেকে হরি মাধবের মামা
কিনে এনেছিলো দুটি জাপানি পাজামা।
পাজামার গায়ে ছিলো লাল-নীল রং
জাপানি ভাষায় লেখা অং বং চং
একটি মাধব পেল অন্যটি হরি
দেখে তাই শ্যামা কেঁদে যায় গড়াগড়ি
বলে, দুই দাদা পেল জাপানি পাজামা
আমায় কী দেবে তুমি তাই বলো মামা
মামা বলে শ্যামা তুই চল দেখি ঘরে
যা এনেছি দেবো তাই দুই হাত ভরে ।

ঘর থেকে ওঠে শুধু ধ্রুম-তাক সাড়া
শুনে হরি-মাধবের চুল হলো খাড়া
হাততালি দিয়ে বলে, বাহারে কী মজা।
আমরা পাজামা পাই শ্যামা পায় সাজা
কালশিরে গায়ে শ্যামা, নাহি খায় ভাত
মোটা দেহ সরু হল যেতে সাত রাত
হাতে পায়ে গুলি গুলি পেশিগুলি জাগে
ভুঁড়ো পেট পিছে হল বুক হল আগে ।

সাতদিন গেলে পরে সোমবার ভোরে
উঠোনে দাঁড়িয়ে শ্যামা ঠ্যাং হাত ছোঁড়ে
সেই সাথে মুখে করে ইয়া-হু-হু রব
দেখে ভারি খুশি হলো হরি ও মাধব।
বলে, মার খেয়ে শ্যামা হয়েছে পাগল
এবারে পেটাবো ধরে চল ভাই চল ।

মোটা মোটা দুই ভাই হাতে লাঠি দুটি
উঠোনে শ্যামার দিকে যায় গুটি গুটি
যেই না দুজনে মিলে লাঠিদুটি ছোড়ে
দুই হাতে দুটি লাঠি শ্যামা নিল ধরে।

তার পরে কী যে হলো কী বা জানি তার
হরি ও মাধব খেলো দারুণ আছাড়
শুয়ে শুয়ে দেখে দুটি তেলপাকা লাঠি
ভেঙে ফেলে শ্যামা যেন দুখানি পাঁকাটি
তার পরে দুই হাতে দুই ভায়ে ধরে
ঘোরালো আড়াই পাক বন বন করে
ঘোরাতে ঘোরাতে বলে, তোদের তো মামা
উপহার দিয়েছিলো জাপানি পাজামা
আমাকেও মামা এনে দিলো উপহার
জাপানি যুযুৎসুর প্যাঁচ গোটা চার।

## নালা

### সোমনাথ ভট্টাচার্য

শুখার দিনে রুখা,
ঝরার দিনে ভরা।
অমনি মোচার খোলা-ডিঙির
মুখ থুবড়ে পড়া।

ভাগ্যি ভালো, বইছে ধারা
ক্ষেত থেকে মাঠ থেকে।
নইলে যেত ঘরদুয়ারে
দুঃখের বান ডেকে।

## কাক ও কোকিল

### মানস সরকার

কোকিলকে দেখলেই কাক যায় ক্ষেপে,
লুকিয়ে কোকিল গাছে থাকে ভয়ে কেঁপে।
কুহু কুহু যেই ডাকে কাক তেড়ে যায়
গাছে আর থাকে না সে তখনি পালায়।
ছুট ছুট কাক ছোটে কোকিলের পিছে
ধরা তাকে যায় না তো ছোটা শুধু মিছে।
কাক বড় বোকা দেখি বোঝে না সে মোটে,
কোকিলের ডিম কেন তার নীড়ে ফোটে।
এসব দেখতে বসে জানালায় থাকি
ইস্কুল ছুটি আজ হোমটাস্ক বাকি।

## ঝড় থেমেছে

### উত্থানপদ বিজলী

বাতাস তো নয়, খুব দাপটে বইছে ঝড়
বাজ পড়ছে আকাশ চিরে কড়াৎ-কড়।
পড়ছে ভেঙে এখান ওখান গাছের ডাল
নিচ্ছে ছিঁড়ে খাপলা মেরে খড়ের চাল।
পাখিগুলোর বিপদ ভারি উড়ছে তারা
কোথায় যাবে, করবে কী আর দিশাহারা।
ঝড় থেমেছে ঝড় থেমেছে, বৃষ্টি বুড়ি...
গান গাইছে টাপুর-টুপুর সৃষ্টি জুড়ি।

## অঞ্জলি

### বিধান সাহা

সকাল সকাল উঠেছি আজ অঞ্জলি যে দিতে
স্নানের শেষে নতুন জামা পরেই হবে নিতে।
মন্ত্র বলা কঠিন জানি বলব তবু মনে,
ছুড়ে দেব হাতের ফুল যে চরণ পরশনে।
রাখিস ভালো দিস মা আশিষ আর কী চাওয়ার আছে
শান্তি সুধা দে ভরিয়ে এইটুকু মন যাচে।

## নবান্ন অঘ্রান

### বিজন দাস

ঘর সাজে আর দুয়ার সাজে নিকন চিকন উঠোন,
হিম শির শির হাওয়া এসে ধানের শিষে লুটন।
ধান আমোদি – দূর খানা ওই দিগন্ত ছুঁই ছুঁই,
চাঁপার ডালে টুনটুনিটা টুইক টুইক টুই।
একটু খুশি আধটু খুশি, বুকে খুশির তোড়,
হিমশিশিরে হিমেল রোদে ধান সোনালি ভোর।
ভোর দুলছে আলোর সুরে দু'পারে টান টান,
বুক থই থই সুখ থই থই নবান্ন অঘ্রান।

## দস্যি ছেলে

### অসীম আচার্য

হয় না যখন সেসব নিয়ে এখন তোমার ভাবনা কী ?
ভাবনাগুলো ছুড়েই ফেলে হাওয়ার সাথে পাল্লা দিই।
নাক ডেকে সব ঘুমোস তোরা সর্ষের তেল দিই ঢেলে
আজব আজব গল্প শোনাও এই নিয়ে যাও সব ফেলে।
ধন্যি তোমার সুখের সময় সাত মন ধান পুড়িয়ে,জ্বেলে
কথায় কথায় অমন করে ! চুপ করে বোস দস্যি ছেলে।

সঞ্চিতা পুজো সংখ্যায় গতবারের প্রচ্ছদ ছবিটি এঁকেছিলেন শিল্পী প্রণব হোড় । তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়নি এজন্য আমরা দুঃখিত।

## মিঠে ছেলেবেলা

### উৎপলকুমার ধারা

যদি ভাবো মনে আলপথ ধরে ধরে
নীলাভ আকাশ গাঁয়ের সীমানা ছোঁয়
মাটির বুকেতে শিউলিরা ঝরে পড়ে
যেখানে শিশির ধানের পাতাকে ধোয় !

ভেবে নিও সেই গাঁয়েতে শরৎ এলে
যখন পুজোর নেই বেশি আর বাকি
খুশির বাঁশিতে ফুঁ-দেয় রাখাল ছেলে
তাকুড়-নাকুড় দেয় বাজিয়ে ঢাকি !

ধরে নিও কোনো শাপলা ঝিলের পাড়ে
মাছ খুঁটে খেতে বুনো বক ছুটে আসে
কাশ দোলা খায় ঝিলটার চারিধারে
ঝিলের জলেতে তুলো-মেঘছায়া ভাসে !

মনে করো সেই ছেলেটা যে হেলাফেলা
ঘাসের উপরে বানিয়েছে খেলাবাড়ি
পাও যদি খুঁজে ফেলে আসা ছেলেবেলা
ভুলেও নিও না তার সাথে যেন আড়ি !

সেই ছেলেবেলা বলবে তোমাকে যেতে
যেথা চালাঘর নয়কো মোটেই ছোটো
খেঁজুর পাতার চাটাই দাওয়াতে পেতে
যেখানে মায়ের মূর্তি গড়ছে পোটো !

ঘুড়ি ওড়াবার ইচ্ছেটা মনে হলে
ছেলেবেলা ফিরে আসবে তোমারই কাছে
দেখা পাবে জানি গাঁয়ের-মায়ের কোলে
মিঠে ছেলেবেলা এখনো লুকিয়ে আছে !!

## প্রায় লিমেরিক

### দুর্গাদাস পাল

ইস্কুল ও কলেজে চেহারাতে "পরি" বেশ
মোড়ক ফেলে টিফিনের বিষিয়ে যায় পরিবেশ
প্যাকেট পলিথিনের
ডাঁই হয় দিনে দিনে,
সত্যি কথায় রাগ, ধরি কান "সরি" বেশ !

## তিন্নির খেলার সাথি

### অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বদু-বদু-বদু,
বদু মানে কদু
কদু মানে লাউ
একটা নাও ফাউ,
লাউ কাঁধে দোষ নাই
আকাশেতে রোশনাই...
বাবার বাবা দাদু
মায়ের বাবাও দাদু
দাদুর বাবা বড়দাদু
বড়দাদু মানেবদু
বদু খায় কদু....
বাবার মা হয় দাদি
মায়ের মা-ও দাদি
দাদি মানে দিদা
দিদা মানে দাদি
আমার খেলার সাথি।

## আয়রে সবাই

### রণজিৎ হালদার

আয়রে ভোলা ভিজিয়ে ছোলা
মশলা তাতে মাখিয়ে দেবো,
দেখবি আগে কেমন লাগে
একটু তোকে চাখিয়ে দেবো।
আয়রে ভুলো চিবিয়ে মুলো
রসিক জনের মান ভাঙাবি,
আয়রে তাথৈ ছড়াবো খই
খুঁটিয়ে সে সব কুড়িয়ে খাবি,
আয়রে যদু লাগিয়ে মধু
মিষ্টি ঠোঁটে জিভ বোলাবি।
আয়রে সোভান একখিলি পান
চিবিয়ে পটল করিস নে ছল
দেবো রে জল গেলাস ভরে,
গলায় দিয়ে ঢক্‌ঢকিয়ে
শেষ করে দে মেজাজ করে।

# দুই ঠকের গল্প

## শিশির বিশ্বাস

ঠক হল যারা লোক ঠকিয়ে খায়, অর্থাৎ প্রতারক। ঠক আজও যেমন রয়েছে, সেকালেও ছিল। আর ছিল তাদের নিয়ে নানা গল্প। এ-গল্পটা শুনেছিলাম আমার দাদুর কাছে। চমৎকার গল্প বলতে পারতেন তিনি। অনেক পরে একটি ওড়িয়া লোককথার সঙ্গে গল্পটির কিছু মিল পেয়েছিলাম। তবে সবটা নয়। তাই মনে হয়, দাদু তাঁর বেশিরভাগ গল্পের মতো এটিও নিজের মতো করে গড়ে নিয়েছিলেন। যাই হোক, এবার গল্পটা শোনো।

গোবরচাঁদ আর গণেশচাঁদ দুই ঠক। নাম আর পেশায় মিল থাকলেও গোড়ায় অবশ্য চেনা-পরিচয় ছিল না। সেটা একরকম হঠাৎ বলা যায়। সে এক হাটের দিন। রোজগারের ধান্দায় খালের পাড় ধরে গোবরচাঁদ চলেছে সেই দিকে। মাথায় বস্তা ভরতি হাবিজাবি গাছের ছাল। ওদিকে গণেশচাঁদও চলেছে সেই হাটের দিকে খালের অন্য পাড় ধরে। তারও মাথায় মস্ত এক বস্তা। তাতে ভরতি উনুনের ছাই।

চড়া রোদে দুই ঠক হাঁটছে, আর আড়চোখে অন্যের দিকে তাকাচ্ছে। মনে মনে ভাবছে, কীভাবে অন্যজনকে ঠকাবে। একসময় গণেশচাঁদ খালের ওপারে গোবরচাঁদকে উদ্দেশ্য করে বলল, "কত্তা, হাটে যাচ্ছ বুঝি। তা বস্তায় কী ?"

"আমার বস্তায় বাপু বাজারের সেরা মানের দারচিনি। গন্ধ পাচ্ছ না ?" বলতে বলতে গোবরচাঁদ বড় একটা সুগন্ধি নিঃশ্বাস টানল। "তা তোমার বস্তায় কী বাপু ?"

"আমার বস্তায় ?" গণেশচাঁদ দেমাক করে বলল, "আমার বস্তায় বাপু সরেস গোবিন্দভোগ চালের গুঁড়ো। হাটে বেচতে যাচ্ছি।"

"তা এক কাজ করো না বাপু।" গোবরচাঁদ জুলজুল করে খালের ওপার থেকে

তাকাল। "হাট তো এখনো মেলা দূর। এই রোদে অত পথ ভাঙার দরকার কী ? যদি রাজি থাকো তো আমার দারচিনির বস্তার বদলে তোমার চালের গুঁড়োর বস্তা বদলে নিতে পারো। কেনাবেচার কাজ এখানেই সেরে ফেলা যায়। হাটে আর কষ্ট করে যেতে হয়না।"

গণেশচাঁদও তো তাই চায়। মাথার বস্তায় তো উনুনের ছাই। তার বদলে এক বস্তা দারচিনি মানে অনেক টাকার জিনিস। খালে জল বেশি নয়। বস্তা মাথায় জল পার হয়ে সে সোজা এপারে এসে হাজির। বস্তা বদল হতে দু'জনের কেউই এরপর আর দেরি করেনি। ফের যদি অন্য পক্ষের মত পালটে যায়, সেই ভয়ে যে যার বাড়ির দিকে দৌড়।

গোবরচাঁদ বাড়িতে এসে মাথার বস্তা নামিয়ে হাঁক পাড়ল, "গিন্নি আজ বেজায় দাঁও মেরে দিইছি। সেই গাছের ছালের বদলে এক বস্তা চালের গুঁড়ো বাগিয়ে এনেছি। ক'দিন ধরে সমানে পিঠের বায়না হচ্ছিল, ছেলেপুলে নিয়ে কত খাবে খাও এবার।"

ওদিকে অন্য ঠক গণেশচাঁদ বাড়িতে বউয়ের সামনে বস্তা নামিয়ে হেসে বাঁচে না। "গিন্নি, আর ভাবনা নেই। তোমার জন্য নতুন গয়নার ব্যবস্থা করে ফেলেছি এবার। মেলা টাকার দাঁও মেরেছি আজ। সেই ছাইয়ের বদলে এক বস্তা দারচিনি !"

বলা বাহুল্য বউদের মুখনাড়ায় দু'জনের মুখ চুন হতে দেরি হয়নি এরপর।

ক'দিন পরে চলতি পথে দুই ঠক ফের মুখোমুখি। দেখা হতেই দু'জন কেঁদে ফেলল ভেউ ভেউ করে।

"ভাইরে, বউয়ের কাছে এমন বেইজ্জতি আগে হইনি। মান রাখা দায় হয়েছে।"

"ভাইরে আমারও সেই অবস্থা। একটা কিছু না করলে বউ-ছেলেপুলের কাছে আর মান থাকছে না।"

"তাই বলি কী," গোরবচাঁদ বলল, "এবার থেকে দু'জন মিলে ঠকের কারবার শুরু করি। তাতে আখেরে দু'জনেরই লাভ হবে।"

গণেশচাঁদ তো মুহূর্তে রাজি। হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "তাহলে কারবার আজ থেকেই শুরু করা যাক।"

সেদিনও হাটবার। মতলব এঁটে দুই ঠক হাজির হল এক কামারশালায়। ফরমায়েশ দিয়ে জুতসই একটা লোহার কড়া তৈরি করাল। সঙ্গে নিল একটা ক্যানেস্তারাও। বিকেলে হাট তখন জমে উঠেছে। ঢাঁই-ঢাঁই শব্দে বিকট আওয়াজে ক্যানেস্তারা পেটাতে পেটাতে দুই ঠক এরপর সেই হাটের মাঝে।

"মহারাজা ঢ্যাঁড়া দিয়েছেন। সবাই শুনুন। এক জরুরি ঘোষণা আছে।"

মহারাজার বেজায় প্রতাপ। যেমন রগচটা, তেমন মেজাজি মানুষ। তাঁর নাম শুনেই হাটের সবাই তো থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। "কী ঘোষণা ভাই ?"

"মহারাজ আগামী হপ্তায় যুদ্ধে বের হবেন। আমাদের পাঠিয়েছেন সেপাই জোগাড়ের জন্য।" গুরুগম্ভীর স্বরে জানান দিয়ে গণেশচাঁদ কোঁচড় থেকে এরপর সেই লোহার কড়া বের করল। "এই কড়া যার হাতে মানানসই হবে, মহারাজার হুকুমে তাকে পলটনে নাম লেখাতে হবে।"

গণেশচাঁদের মুখের কথা খসতে না খসতেই হাট প্রায় সাফ। মুহূর্তে যে যেদিকে পারে দৌড়। গ্রামের হাট। সবাই ছা'পোষা মানুষ। বউ-ছেলেপুলে নিয়ে সংসার। কে যুদ্ধে গিয়ে বেঘোরে প্রাণ খোয়াতে চায় ? কিন্তু দুই ঠক ছাড়বে কেন ? ছুটে গিয়ে পাকড়াল এক ধান-চালের ব্যাপারীকে। বেচারা মালপত্র ফেলে পালাতে পারেনি। গণেশচাঁদ নিমেষে সেই কড়া পরিয়ে ফেলল তার হাতে।

"বাহ্ ! এই তো দারুণ মামানসই হয়েছে। শরীলে তাকত আছে দেখছি। এমন লোকই মহারাজের পলটনে দরকার।" গণেশচাঁদ দাবড়ে উঠল, "তা এবার নাম-ঠিকানা বলে ফেল দেখি, পলটনের লিস্টিতে দেগে নিই। খবর্দার, মিছে কতা কইবিনি। মহারাজের হুকুমে গর্দান যাবে।" বলতে বলতে পকেটে হাত দিল সে।

গোবরচাঁদ ইতিমধ্যে তাকে পিছন থেকে চেপে ধরেছে। পালাবার উপায় নেই। লোকটা হাউমাউ করে উঠল, "না রে ভাই, দেখতেই এমন, আসলে কলজেয় রক্ত নেই মোটে। বেবাক জল। ঘরের বউই দু'বেলা পেটায়। গায়ে এক রত্তি শক্তি নেই।"

"মিছে কতা কওয়ার জায়গা পাওনি ? ধমকে উঠল গণেশচাঁদ। "দিব্যি তো পাল্লা ভরতি ধান মাপতেছিলে ! এক একবারে বিশ সের। দেখিনি ভেবেছ ?"

অগত্যা উপায় নেই দেখে লোকটা এবার অন্য পথ ধরল। ব্যবসায়ী মানুষ। কোন দেবতা কিসে তুষ্ট ভালই জানে। প্রাণের দায়ে কোমরের গেঁজে থেকে এক খাবলা চকচকে টাকা বের করে বলল, "দাদা গো আমি নেহাত চালের ব্যাপারী। ঢাল-সড়কির খোঁজ রাখি না। বরং কিছু ধরে দিচ্ছি, নিয়ে ক্ষ্যামা দেন।"

শিকার যখন লাইনে এসে গেছে, দুই ঠক আর দেরি করল না। ছোঁ মেরে টাকাগুলো হাতিয়ে নিয়ে ছুটল আর একজনকে পাকড়াতে। হাটের অন্য ব্যাপারীরাও গুছিয়ে ফর্সা হতে শুরু করেছে। সময় নষ্ট করা যায় না।

সন্ধের আগেই দুই ঠগের ট্যাঁক বোঝাই। রাতে ঘরে ফিরতে ওদের বউরাও আহ্লাদে আটখানা। এমন স্বামীর জয়গান করেও সুখ।

দিন কয়েক পরে দুই ঠক ফের ধান্দায় বের হয়েছে। ঘুরতে ঘুরতে এসে হাজির দূরের এক গ্রামে। খোঁজ পেয়েছে, সেখানে এক বুড়ির মেলা টাকাপয়সা, সোনাদানা। নিজের মানুষ বলতে তিন কূলে দূর সম্পর্কের এক নাতি। সে কখনো এসে দেখে যায়। একাই থাকে বুড়ি। খবরটা শুনেই দুই ঠক মতলব করে বুড়ির বাড়ি এসে পায়ের কাছে আছড়ে পড়ল। "পিসি গো, এমন হাল হয়েছে তোমার ! হায়! হায় !"

থতমত খেয়ে বুড়ি তো হাঁ করে তাকিয়ে আছে। গণেশচাঁদ হাত-পা নেড়ে ব্যক্ত করল, "পিসি গো, আমরা হলাম তোমার আপন মামাতো ভাইয়ের দুই পুত্তুর। বাবার কাছে তোমার কথা কত শুনেছি। তাই তো খুঁজতে খুঁজতে চলে...।" বলতে বলতে গলা ধরে এল তার। কথা শেষ না করে কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছতে লাগল।"

দেখে গোবরচাঁদ এবার পোঁ ধরল, "পিসি গো, কোলে করে কত আমের আচার খাইয়েছ তুমি। শীতকালে পিঠে পায়েস। মুখে লেগে আছে এখনো। মনে নেই তোমার ?"

"সব, সব মনে আছে রে বাছা। মনে আছে।" পুরোনো কথা ভেবে বুড়ি হাত-পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসল এবার। তারপর চোখের জল মুছে বলল, "তোরা অত দূর থেকে পিসির খোঁজ নিতে এয়েছিস চাট্টি খেয়ে জিরিয়ে নে আগে। আমি ভাত চাপিয়ে দিচ্ছি।"

কেল্লা প্রায় ফতে। গণেশচাঁদ বলল, "পিসি গো, আসল কথাই তো বলিনি। সামনের হপ্তায় ছেলের বিয়ে ঠিক হয়েছে। এবার তোমার খোঁজ যখন পেয়েছি, আশীর্বাদের দিন যেতেই হবে। নয়তো ছেলের বিয়েই দেব না।"

"সে হবে বাবারা।" বেজায় খুশি হয়ে বুড়ি বলল, "দূর থেকে এসেছিস, তেল দিচ্ছি, চানটা সেরে আয় এবার।" বুড়ি এরপর সিন্দুক খুলে চমৎকার এক সোনার তেলের বাটি বের করে ওদের হাতে দিয় পুকুর থেকে চান করে আসতে বলল। দু'জন সেই তেলের বাটি নিয়ে ছুটল পুকুরের দিকে। তারপর চান সেরে ফিরে এসে হাউমাউ চিৎকার। "পিসি গো, ঘাটে তেলের বাটি রেখে সবে জলে নেমেছি, এক বজ্জাত কাক এসে বাটিটা নিয়ে উড়ে গেল। ভিজে কাপড়ে দু'জন ছুটে ছুটে হয়রান। কিন্তু হদিশ পেলাম না। কী লজ্জার কথা বলো দেখি ! খেতে বসার মুখ নেই আর। হায়-হায় !"

আসলে সবটাই মিছে কথা। অমন সোনার বাটি দেখে দুইজন আর লোভ সামলাতে পারেনি। পকেটে ভরে ফেলেছে।

ভেবেছিল, বুড়ি হয়তো দু'কথা শোনাবে। কিন্তু বুড়ি তার ধার দিয়েই গেল না। বরং সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "লজ্জা পাসনি বাছারা। পোড়া কপাল আমারই। নইল শুভ কাজের শুরুতেই এমন হবে কেন ? তা ভাবিসনি বাছারা। আজই আমার নাতিকে খবর পাঠাচ্ছি। আমার বদলে সেই গিয়ে অশীর্বাদ করে আসবে।"

বুড়ির নাতি প্রায় ওদেরই বয়েসি। খবর পেয়ে পরের দিন এসে পৌঁছুতে বুড়ি সিন্দুক খুলে হিরে মণিমুক্তো বসানো একছড়া হার বের করল। তারপর নাতির হাতে দিয়ে বলল, "আমার হয়ে তুই আশীর্বাদ করে আয়।"

বুড়ির নাতি তেজি এক ঘোড়া নিয়ে এসেছিল। তার পিঠে তিনজন রওনা হয়ে পড়ল। অনেক পথ পার হয়ে ঘোড়া এক ভিন গ্রামের পথ ধরেছে, দুই ঠক কাঁচুমাচু হয়ে বলল, "দাদাভাই, বেজায় খিদে পেয়েছে গো। এদিকে পকেটে কানাকড়ি নেই। ওই হারছড়া থেকে একটু সোনা যদি দাও, কিছু পেটে দিয়ে প্রাণ বাঁচাই।"

"আরে সেজন্য সোনার গয়নার দরকার কী ?" বুড়ির নাতি হাসল ওদের কথায়। "এদিকে সবাই আমার চেনা। বললেই ধারে মাল দেবে।"

কথা শেষ করে একটু পরেই সে পথের পাশে এক সরাইখানার সামনে ঘোড়া দাঁড় করিয়ে ওদের দিকে তাকাল। "তবে একটা কথা ভাই। মালিক হয়তো জানতে চাইবে এক না দুই। তা দু'জন যখন খাবে জানিয়ে দেবে দুই। ঠিক আছে ?"

পথের ধারে মস্ত সরাইখানা। সামনে খাওয়ার ঘর খদ্দেরের ভিড়ে সরগরম। সবাই গবগব করে খাবার সাঁটাচ্ছে। জনা কয়েক কর্মচারী তাদের সামাল দিতে হিমসিম। সেদিকে তাকিয়ে সুড়ুত করে জিবের জল টেনে দুই ঠক ঘাড় নাড়ল।

বুড়ির নাতি এরপর ওদের অপেক্ষা করতে বলে সোজা সরাইখানার মালিকের ঘরে ঢুকে কানে কানে বলল, "গুরু তোমার সরাইখানায় ব্যাগার খাটার জন্য দু'জন জবরদস্ত কাজের মানুষ ধরে এনেছি আজ।"

মালিক বাইরে দুই ঠকের দিকে এক পলক চোখ বুলিয়ে নিয়ে অল্প ঘাড় নাড়ল। "হুম, মন্দ নয় দেখছি। তবে এক বছর ব্যাগারের জন্য কিন্তু বেশি দাম দিতে পারব না।"

"না গুরু", বুড়ির নাতি ফিসফিস করে বলল, "ওরা দুই বছরের জন্য ব্যাগার দিতে রাজি হয়েছে। বিশ্বাস না হয়,

নিজে গিয়ে শুধিয়ে দেখ।"

সরাইখানার মালিক এরপর ওদের কাছে এসে বলল, "এক না দুই ?"

দুই ঠক তৎক্ষণাৎ মাথা নেড়ে বলল, "দুই দুই।"

খুশি হয়ে মালিক এরপর ওদের ভিতরে বসিয়ে ছুটল বুড়ির নাতির কাছে। ঝনঝন করে মোহর গুনে নিয়ে বুড়ির নাতি এরপর এক ফাঁকে পগার পার।

ওদিকে দুই ঠক তো ভুরিভোজের অপেক্ষায় হাঁ করে বসে আছে। এমন সময় মালিক এসে বলল, "সংয়ের মতো বসে না থেকে এবার কাজে লেগে পড় দেখি।"

শুনে দুই ঠক তো প্রায় খাবি খাওয়ার জোগাড়। আকাশ থেকে পড়ে বলল, "কাজে লাগব মানে ? দু'জন সেই থেকে খাওয়ার জন্য বসে আছি !"

শুনে শুধু মালিক নয়, হোটেলের অন্যরাও হেসে খুন। কথা শোনো দুই উজবুকের !

মালিক ষণ্ডা গোছের মানুষ। কথা না বাড়িয়ে বিরাশী সিক্কার রদ্দা দুই ঠগের ঘাড়ে কশিয়ে দিয়ে বলল, "হতভাগা, দুই বছর ব্যাগার দেবার কড়ার করে এখন বায়নাক্কা ! খাবার মিলবে সেই রাত দুপুরে। এক সানকি ভাত। সময় নষ্ট না করে দুই চাঁদ এবার কাজে লাগ দেখি।"

বুড়ির নাতি যে ওদের দুই বছরের জন্য সরাইখানায় বেচে দিয়ে গেছে, দুই ঠকের মালুম হতে এরপর দেরি হয়নি। বুড়ি আর তার নাতি যে ওদের চাইতেও বড় ঠক, আগে ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি কেউ। কিন্তু তখন কপাল চাপড়ানো ছাড়া আর কিছুই যে করার নেই।

দু'বছর ব্যাগার দেবার কথা। কিন্তু দুই মাসেই ওদের যা হাল হল, তা কহতব্য নয়। দিন-রাত্তির গাধার খাটুনি। পান থেকে চুন খসলেই ষণ্ডা মালিকের রদ্দা। খাবার বলতে সেই রাত দুপুরে এক সানকি ফেলাছড়া ভাত। তাও পেট ভরে নয়। দু'মাসেই দু'জন শুকিয়ে প্রায় কাঁকলাস। লম্বা চুল-দাড়িতে তেলের অভাবে জট পড়তে শুরু করেছে। চেনাই মুশকিল। এর মধ্যেই ঘটল এক ব্যাপার। সেদিন দু'জন খাবার ঘরের এঁটোকাঁটা সাফ করছে, কোতোয়ালি থেকে উর্দিপরা এক পেয়াদা হঠাৎ সরাইখানার সামনে ঘোড়া থেকে নেমে মালিকের ঘরে গিয়ে ঢুকল। বাইরে থেকে তাদের কথার দু'এক টুকরো কানে আসতে দুই ঠকের তো প্রায় নাড়ি ছেড়ে যাবার জোগাড়।

কী ভয়ানক ! সেই যে হাটে মহারাজার নাম করে দুইজন ঠকবাজি করে এসেছিল, কীভাবে সেই কথা পৌঁছে গেছে মহারাজের কানে। খেপে গিয়ে দুই ঠককে ধরে আনার এতেলা পাঠিয়েছেন তিনি। খোদ মহারাজের আদেশ বলে কথা। পেয়াদা সেই খোঁজে এসেছে সরাইখানায়। ভাগ্যিস, অনাহারে দু'জনের চেহারা একেবারে শুকিয়ে কাঠ হবার জোগাড়, তায় চুল-দাড়ির জটলা। তাই চিনতে পারেনি।

খানিক খোঁজ খবরের পর পেয়াদা বিদেয় নিতে দুই ঠকের ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে এল। দিনটা কোনক্রমে কাটল। তারপর রাত একটু গভীর হতেই দু'জন সোজা মালিকের ঘরে। মালিক তখন খেরোর খাতায় দিনের হিসেব লিখছিল। মুখ তুলে তাকাতেই একজন বলল, "হুজুর পেয়াদা যাদের খোঁজে এসেছিল, আমরাই সেই দুইজন।"

"অ্যাঁ !" কেঁপে গিয়ে মালিকের হাতের কলম ছিটকে পড়ল খানিক দূরে।

"আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর। পেয়াদার তাড়া খেয়ে পালিয়ে আপনার সরাইখানায় এসে উঠেছিলাম। তা দুই মাসে যে হাল করেছেন, ভাবছি ধরাই দেব এবার। এই কষ্টের থেকে গর্দান যাওয়া ঢের ভাল। তবে ঠিক করেছি, সেই সাথে আপনাকেও শূলে চড়াবার ব্যবস্থা পাকা করে যাব। তাতে মরেও শান্তি।"

"ঠ-ঠকবাজি করেছি স তোরা। আমি শূলে চড়তে যাব কেন ?" বলতে গিয়ে মালিকের গলা কেঁপে গেল।

"সব জেনে-শুনেও আমাদের এখানে লুকিয়ে রেখেছেন, তাই।" দুই ঠকের হাসি গাল ছাপিয়ে কান পর্যন্ত পৌঁছে গেল।

"না-না, তা কেন !" দুই ঠগের মুখের দিকে তাকিয়ে মালিক এবার প্রায় হাহাকার করে উঠল। "তোরা বরং এক কাজ কর বাবা। দু'টো ঘোড়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, আজ রাতেই রাজ্য ছেড়ে পালা।"

"কিন্তু দুই বছরের মাইনেটাও যে মিটিয়ে দিতে হবে।"

"দু-দু'বছর কী বলছিস বাবা। মাত্র তো দু'মাস কাজ করলি এখানে।"

"ফ্যাঁকড়ায় না পড়লে সেই দুই বছরই তো খাটাতে বাপ। এখন না হয় ফাঁদে পড়ে কাউমাউ।" গণেশচাঁদ বলল, "চল রে গোবরা, তাহলে কোতোয়ালির দিকেই যাই।"

"না-না, না।" বেজায় ঘাবড়ে গিয়ে মালিক ওদের পায়ের উপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

তারপর ? তারপর দুই বছরের মাইনে বাবদ দুই ঠক সরাইখানার মালিকের কাছ থেকে কুড়ি কুড়ি চল্লিশ মোহর বুঝে নিয়ে দুটো ঘোড়ায় সরাইখানা ছাড়ল সেই রাতেই। তারপর হরেক কৌশল খাটিয়ে দিন কয়েকের মধ্যে বউ-ছেলে নিয়ে ভিন রাজ্যে। সেইসঙ্গে নাক-কান মুলে শপথ, ঠকবাজি কাজ আর নয়। কপালজোরে এ যাত্রায় প্রাণ যখন বেঁচেছে। বাকি জীবনটা সৎপথেই কাটাবে।

কেনিয়ার লোককথা

# উটপাখি লম্বা গলা পেল কী ভাবে

## সুনির্মল চক্রবর্তী

এক সময় ছিল যখন উটপাখির গলা এতোটা লম্বাটে ছিল না। লম্বাটে না হওয়ায় ওদের অনেক অসুবিধে হত। মাটি থেকে কীটপতঙ্গ বা পোকামাকড় খুঁজে তারপর ঠোঁটে ধরে খেতে গিয়ে মাটিতে বসে পড়তে হত। তাছাড়া এখন যেমন উঁচু গাছ থেকে ফলমূল অনায়াসে পেড়ে খাওয়া যায় তখন তা হত না।

উটপাখির গলা লম্বা কী করে লম্বাটে হল, এখন সে গল্পই তোমাদের শোনাব।

এক ছিল নদী। সে নদীতে থাকত একটা কুমির। একদিন কুমিরের দাঁতে যন্ত্রণা শুরু হল। কুমির বুঝল ব্যথাটা ক্রমশই যেন বাড়ছে। কুমির এল নদীর কিনারায়। সেখানে একটা হরিণ এসেছে। জল খেতে হরিণকে রোজই আসতে হয়। কুমির ভাবল হরিণ নিশ্চয়ই তার উপকার করতে পারে। তা-ই বলল, হরিণ ভাই, হরিণ ভাই, একটা উপকার করবে ? দাঁতে যন্ত্রণা হচ্ছে, যদি তোমার শিং দিয়ে আমার দাঁতটা উপড়ে ফেল, তবে শান্তি পাই।

কুমিরটা বদস্বভাবের। এটা সকলেরই জানা ছিল।

হরিণ কোনো উত্তর না দিয়ে দিল ভোঁ দৌড়।

কুমির তো অবাক !

কিছু পরেই সেখানে এল এক বানর। সে অবশ্য জল খেতে আসেনি। কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে খেলতে এসেছে নদীর পাড়ে। কুমির জল থেকে উঠে এসে বলল, বানরভাই, বানরভাই, একটা উপকার করবে ? দাঁতে যন্ত্রণা হচ্ছে। যদি তোমার ধারালো নখ দিয়ে ব্যথার দাঁতটা তুলে ফেল, তবে বড়োই শান্তি পাই, তোমার উপকার জীবনেও ভুলব না।

কুমিরের স্বভাব-চরিত্র বানরের জানা, কোনো উত্তর না দিয়ে বাচ্চাকাচ্চাদের বগলে পুরে, সে-ও দিল ভোঁ-দৌড়।

কুমির এবারেও অবাক !

কিছু পরেই সেখানে জল খেতে এল এক উটপাখি। সারাদিন রোদ্দুরে ঘুরে ওর জল তেষ্টা পেয়েছিল খুব। ওদিকে তখন কুমির দাঁতের যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। কুমির কোঁকাতে কোঁকাতে বলছে, ভাইরে ভাই, বোধহয় মারা পড়লাম। তোমার মতো এত উপকারী পাখি এই দুনিয়ায় আর নেই। আমাকে বাঁচাও ভাই।

উটপাখি খুবই সহজ সরল। গোলমেলে স্বভাবের সে নয়। কুমিরের কষ্ট শুনে বলল, তোমার কী হয়েছে ভাই ?

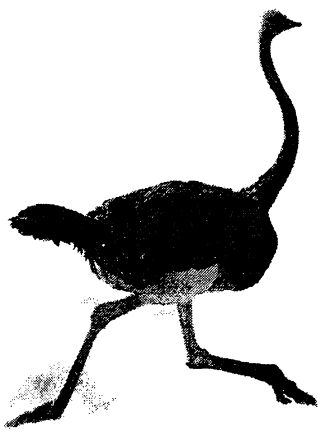

কুমির তার কান্নাভেজা গলায় বলল, একটা উপকার করবে ভাই ?

উটপাখি বলল, বলোই না।

কুমির বলল, আমার দাঁতে যন্ত্রণা হচ্ছে। যদি তোমার শক্ত ঠোঁট দিয়ে আমার খারাপ দাঁতটাকে তুলে ফেল, বড়োই শান্তি পাই। বন্ধু হিসেবে এইটুকু উপকার আমি কি পেতে পারি না ? তোমার উপকার সারা জীবন ধরে আমি মনে রাখব।

কুমিরের কথায় উটপাখির মন গলে যায়। বলে, তোমার কাজটা আগে তো করি। বন্ধুকে রক্ষা করাই যে বন্ধুর কাজ। কাছে এসে উটপাখি এবারে তার ঠোঁটসহ মাথা কুমিরের গলার ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়। কোন দাঁতটা কুমিরকে কষ্ট দিচ্ছে ভালো করে দেখতে থাকে।

ওদিকে কুমিরটা ছিল বড্ড বদমাশ। দাঁতের যন্ত্রণায় সারাদিন খাবারের কথা ভুলেই গিয়েছিল। শিকার যখন এত কাছে, সে ভুলেই গেল দাঁতের ব্যথা, উটপাখির মাথা চেপে ধরতে শুরু করল।

উটপাখি এটা হবে ভাবতেই পারেনি। সে তখন যন্ত্রণায় ছটফট করছে।

তখনই নদীতে জল খেতে এসেছে হাতি। উটপাখির কান্না শুনে হাতি বলছে, কুমির এটা তুই ঠিক করছিস না। শিগগির ওকে ছেড়ে দে বলছি। নইলে কিন্তু ভালো হবে না।

হাতির গর্জন শুনে কুমির তো ভয়ে অস্থির। ওদিকে তখন সবটুকু শক্তি দিয়ে উটপাখি ওর মাথা বের করে আনার চেষ্টা করছে। যত চেষ্টা করছে ওর গলাও লম্বা হতে শুরু করেছে। চলছে তুমুল টানাটানি। শেষমেশ জয়ী হল উটপাখি। হাতিদাদা সামনে এগিয়ে না এলে, এত সাহস কে জোগাত তাকে ? হাতিদাদাকে তাই সে খুব ধন্যবাদ জানাল।

তারপর উটপাখি, সে-ও দিল ভোঁ দৌড়। ছুটছে তো ছুটছেই। এত জোরে সে এর আগে কখনই দৌড়য়নি। কিছুদূর যেতেই মনে হয় সে তো আগের মতো নেই। তার গলা এতোটা লম্বাটে তো কোনো কালেই ছিল না। তাই সে বড্ড অবাক হয়। প্রথমটায় একটু ঘাবড়ে গেলেও, মনে মনে এবারে সে খুশিই হয়। সামনে একটা উঁচু গাছে ফল হয়েছে দেখে, সে এগিয়ে আসে। লম্বাটে গলা বাড়িয়ে দিব্যি সে ফলটাকে পেড়ে আনে। মাটিতে একটা পোকাকে যেতে দেখে, গলা নামিয়ে দিব্যি সে ওকে ঠোঁটে ধরে মুখে পুরে দেয়। বেশ মজা তো ! তাই বলে সে কুমিরকে ধন্যবাদ জানাবে কি ? মোটেই না। ওই রকম বদমাশের খপ্পরে পড়া মোটেই ভালো নয়। যে উপকারীকেও মারতে দ্বিধা করে না। আর একটু দেরি হলে ওর দেহটা বদমাশটার পেটেই চলে যেত। দেহ গেলে প্রাণটাও যেত, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

## দোয়েল ডাকে

**প্রবীরকুমার সামন্ত**

দোয়েল পাখি শিস দিয়ে ডাকে, আয়রে খোকন আয়,
নীল দিগন্তে উড়বো দু'জন দুরন্ত পাখনায়।
দেখবে কতো সাগর নদী — ছুটছে পাগলপারা
ফুলের বনে সুয্যি হাসে ফুল পরিদের সাড়া
প্রজাপতি পাখায় কেমন ইন্দ্রধনু আঁকে —
ঘর ছেড়ে পা বাইরে দিলে জানবে অজনাকে।
গাছেরা তো প্রাণবায়ু দেয় সবুজ পাতার গানে
বর্ষাকালে চাষের খবর বৃষ্টি পাখায় আনে।
কত রকম শস্য মাঠে লক্ষ্মীর সম্ভার —
পূর্ব তোরণে আলোর জোয়ার খুলছে নতুন দ্বার।
কত দেশের উপর দিয়ে ঝর্ণা নদী পাহাড়
তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে যাত্রা থামল এবার।
বন্ধু পাখি বলল খোকন, দেখলে তো পৃথিবীকে
অবাক হবার কত জিনিস ছড়িয়ে দিকে দিকে —
স্বপ্নের-ঘোর বলল খোকন, জ্বাললে জ্ঞানের আলো,
চিরসঙ্গী থাকো দোয়েল, তুমি বড়ই ভালো।

## আলোকবর্ষ দূরে

**সুপর্ণা ভৌমিক চক্রবর্তী**

ওই যে যেখানে, অনেকটা দূরে, জ্বলছে হাজার তারা
সেইখানে আর কেউ জেগে নেই রাতের আকাশ ছাড়া ?
আমরা যেমন দিব্যি রয়েছি সৌরজগত-মাঝে
ওই তারাদের হয়ত এমন সংসার ঠিক আছে।
সেই কোনো এক তারার মহলে একটি সবুজ গ্রহে
হয়ত-বা কেউ জেগে বসে আছে অফুরান আগ্রহে।
সেও বুঝি খোঁজে রাতের আকাশে আলোময় স্পন্দন,
সেও বুঝি চায় দূর-পৃথিবীর ভালোবাসা, বন্ধন।
তাকে পাঠালাম বার্তা আমার, পৌঁছবে পথ ঘুরে—
বন্ধু আমার থাকে যে অনেক আলোকবর্ষ দূরে।

*এরপর সঞ্চিতায় কোন লোককথা বা উপকথা প্রকাশিত হবে না। এক হাজার থেকে পনেরশো শব্দের মধ্যে মৌলিক গল্প কাম্য। বড় গল্প ছাপানো সম্ভব নয়। - সম্পাদক*

# ছোটদের পাতা

## দুর্গাপুজোর সাতকাহন

**ঈলিতা চট্টোপাধ্যায়**

ষষ্ঠীতে মা উমা এল গিরিরাজের ঘরে —
মা মেনকা বেজায় খুশি, একটি বছর পরে।
সঙ্গে আছে লক্ষ্মী, সরো, কেতো, গণপতি -
মামা বাড়ি এসে তারাও করছে হুটোপুটি।
ছুটছে তারা এদিক ওদিক, গাইছে ছেড়ে গান
বকলে তাদের, দাদু-দিদার হচ্ছে অভিমান।
সপ্তমীতে রাঁধলো দিদা নানা রকম সবজি
খেলো তারা আনন্দেতে ডুবিয়ে তাদের কবজি।
অষ্টমীতে মাংস ভাতে শেষ হল যে খাওয়া
শেষ পাতেতে পড়ল পায়েস, মিষ্টি এবং মোওয়া।
নবমীতেও হল খাওয়া, নানা রকম খাবার
রাতের বেলা তোড়জোড় সব কৈলাসেতে যাবার।
দশমীতে মা মেনকা ভাসেন চোখের জলে —
ভরে দিলেন ব্যাগ-পুঁটুলি নানা রকম ফলে।
পরের বারে চেষ্টা করিস আসতে তাড়াতাড়ি —
ফিরে গিয়ে আলো করে সাজাস শ্বশুরবাড়ি।

## ছড়া

**সোহিনী নন্দী (২য় শ্রেণি)**

বাঁদরেরা গাছে থাকে
নাই কোন চিন্তা,
গাছে গাছে লাফিয়ে বেড়ায়
নাচে ধিন-ধিনতা।

## গোয়েন্দা রিহানা

**অনমিত্র দেওঘরিয়া (৩য় শ্রেণি)**

রিহানা ছিল একটি ছোট মেয়ে। সে থাকত কলকাতায়। একদিন সে বিকেলে খেলছিল তার বন্ধুদের সাথে। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমে এল। রিহানা ও তার বন্ধুরা বাড়ি ফিরছে এমন সময় একটা ভাঙা ঘর থেকে গুলির শব্দ পাওয়া গেল।

তারপর দিন সকালে রিহানা গেল সেই ভাঙা ঘরটাতে এবং সে ঘরে দেখতে পেল একটা চশমার ভাঙা কাঁচ। ভাঙা কাঁচটা সে কুড়িয়ে নিজের কাছে রেখে দিল। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে একমাত্র চশমার দোকানে গিয়ে জানিয়ে এল যে, কেউ যদি একটা ভাঙা কাঁচ নিয়ে চশমা সারাতে আসে তাহলে আমায় ফোন করবে।

তারপর দিন একটা লোক এল চশমা সারাতে। দোকানদার রিহানাকে ফোন করল। রিহানা পুলিশ নিয়ে লোকটাকে ধরে ফেলল।

## মা ও বাবা

**তনুব্রত সরখেল (১ম শ্রেণি)**

আমার মা বাবা খুব ভালো। একদিন এক গরিব মানুষ বসে বসে কাঁদছে তখন আমার বাবা ১০ টাকার নোট তাকে দিয়ে দিল। আমার মা দিদা, ঠাকুমা ও দাদুভাইকে দুর্গাপূজায় ফোন, ব্যাগ আরো অনেক কিছু কিনে দেয়। আমার মা -বাবা আমার ও ভাইয়ের খুব ভালো চায়। আর আমার শিক্ষকরা খুব ভালো। আমাকে মারে না বকে না। আমাদের অনেক পড়া। বাংলা, ইংরাজি, অঙ্ক, পরিবেশ অনেক কিছু।

# মশা থেকে হাতি

## অবি সরকার

একবার হাতের কাছে পাই, গালে এমন এক থাপ্পড় মারবোনা, চোখে অন্ধকার দেখবি — ঘোর অমাবস্যা।

ক'দিন ধরেই মশার বাড়াবাড়ি উপদ্রবে আজ খেপে গেল নাড়ুকুড়ু। নানি মুচকি হেসে বললেন, মশার আবার গাল। খুঁজে পাবি ? কেউ কোনদিন মশার গালে কাউকে থাপ্পড় মারতে দেখেছে ? আমি তো দেখিনি।

একটু থেমে নানি আবার বললেন, সেই থাপ্পড় খেয়ে মশা আবার অন্ধকার দেখবে ? ওরা তো অন্ধকারেই বেশি কামড়ায়। মাথায় আসেও তোর।

নাড়ুকুড়ু অনেকক্ষণ ভাবল। তারপর বলল, সত্যি ওদের গাল হয়না নানি ? তাহলে খায় কী করে ?

নানি বললেন, আমরা তো জানি, ওদের একটা নাক আছে লম্বা সুঁচের মতো। সেটা ফুটিয়ে রক্ত শুষে খায়। দাঁত লাগেনা, তাই চোয়ালও থাকেনা। হাঁ ও করে না। গাল হবে কী করে ?

— নানার আতসিকাচটা দেবে ? যার মধ্যে সব কিছু বড় হয়ে যায়।

— আতসকাচ। কী হবে তা দিয়ে ?

— মশা দেখবো। এই তো মেরেও রেখেছি। এখনো আস্ত আছে। পা আছে, পাখা আছে, দেখতে হবে চোখ মুখ নাক কপাল কেমন হয়।

ওর কৌতুহল মেটাবার জন্য ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা দেওয়া হল। ও মন দিয়ে পর্যবেক্ষণ করল মরা মশাটাকে।

— রং নেই। ব্লাক এন্ হোয়াইট। চোক্ আছে, কিন্তু অটুকুন চোক্ দিয়ে কী করে দেখতে পায় ? নাকের গোড়ায় যেখান থেকে দাঁত বেরোয় — সেই মুখের মতো একটা গর্ত আছে বটে — কিন্তু সেটা মুখ কী না বোঝা যাচ্ছে না।

হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল, নানি, ওদের কান কোথায় ?

নানি রান্নাঘর থেকে উত্তর দিলেন, ওদের কান বোধহয় নেই।

— তাহলে ওরা আমাদের কথা শোনে কেমন করে ?

— ওরা আমাদের কথা শোনে - কে বলেছে তোমাকে ?

— শ্বাস নেয় তো ?

— নিশ্চয়ই নেয়। শ্বাস না নিলে কেউ বাঁচে নাকি ?

— খুব গোলমেলে ব্যাপার, নানি। নাকটা তো সুঁচের মতো। ইনজেকশানের সুঁচ

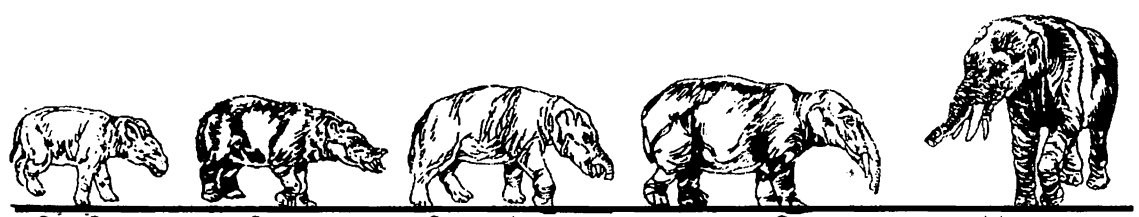

মোরিথেরিয়াম ফিওমা পোলিওমাস্টোডন গোম্ফোথেরিয়াম টেটালোফোডন

যেমন। সেটা ঢুকিয়ে রক্ত চোষে। রক্ত চুষতে তো অনেক সময় লাগে। তাহলে শ্বাস নেবে কেমন করে ? বিষম খাবেনা ? মনে নেই আমি একবার নাক টিপে দুধ খেতে গিয়ে কেমন বিশ্রি বিষম খেয়ে ছিলাম ?

— তুমি তো মশা নও।

— তাহলে তুমি বলছ মশারা বিষম খায় না ? অনেকক্ষণ শ্বাস বন্ধ করে থাকতে পারে ?

তা আমি হলপ করে বলতে পারিনা। এবার মশা দেখা বন্ধ করে পড়তে বসো। অনেক গবেষণা হয়েছে।

— দাঁড়াও, আগে ওদের কৌশলগুলো বুঝি। ঐটুকু একটা পুঁচকে মশা তার এত সাহস কী করে হয়, আমাদের মতো এতবড় মানুষকে, যেমন খুশি, যখন তখন, যেখানে সেখানে হুল ফোটাবার ? আমি মাকড়সা দেখে ভয় পাই, আর ওরা আমাদের ভয় করে না ? কেন ?

— ওদের তো বুদ্ধি নেই। যারা নির্বোধ হয়, তারা অকুতোভয় হয়। থাপ্পড় খেয়ে বা বিষের ধোঁয়ায় মরণ হতে পারে বোঝেই না। তুমি তো হাতিকেও ভয় পাও, অথচ ওরা হাতিকেও কামড়ায় থুড়ি, হুল ফুটিয়ে রক্ত শুষে নেয়। একটুও মান্য করে না।

হঠাৎ নাড়ুকুড়ু থমকালো। কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল, হাতি বললে, তাই না ? দাঁড়াও ভাবতে হবে।

তারপর আতসকাচ নিয়ে এগিয়ে পিছিয়ে, হুমড়ি খেয়ে, নাক ঠেকিয়ে, অনেক কায়দা করে মশার মৃত শরীর পরীক্ষা করতে করতে আপন মনে বকে যেতে লাগল — হুঁ হুঁ বাবা, আমার চোক্‌কে ফাঁকি দেবে ? খুব মিল, আশ্চর্য মিল। তাই তো বলি, মুখ একটা আছেই। ওর না থাকলেও হাতির তো আছে। আর মশার তো সেপ্‌টা আছে।

তারপর চেঁচিয়ে বলল, জানো নানি, মশা আর হাতি আসলে একই জাতি। মশা তো সব চেয়ে প্রাচীন প্রাণী। হাতি ঐ মশাদের বংশদর। আমি নিশ্চিত। কোনো একপ্রকার মশার ডানা খসে গিয়েছিল একদিন। তারাই তখন উড়তে না পেরে হাঁটতে থাকল। হাঁটতে হাঁটতে পা গুলো বেশ শক্ত পোক্ত হয়ে গেল। শরীরটা তো গোল ছিলই। এবার নাকটাও লম্বা হতে থাকল। নতুনের মধ্যে শুধু কানটা গজাল। আমি তোমাকে ছবি এঁকে ঠিক বুঝিয়ে দিতে পারব নানি। একেবারে জলের মতো পোস্কার। সেই যে নানা একটা প্রবচন বলেনা – হাতি ঘোড়া গেল তল, মশা বলে কত জল। নানাও জানে, মশা থেকেই হাতির শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। সেই জন্যই মশারা হাতিকেও কামড়ায়, কিন্তু হাতি ওদের মারতে পারেনা। কৃতজ্ঞতা আছে না ? ঠাকুরদার বাবার বাবার ঠাকুরদা বলে কথা !

নিজের আবিস্কারে নাড়ুকুড়ু এতটাই আত্মশ্লাঘা অনুভব করল, যে কিছু সময় গড়িয়ে নিয়ে খুশি হয়ে গুনগুন করে সুর ভেজে চারখানা স্কেচ্ করে ফেলল — কেমন করে মশা থেকে ক্রমে ক্রমে হাতি হল। আর তক্ষুণি নানা ঘরে ঢুকলেন। এবং নাড়ুকুড়ুর পাশে পড়ে থাকা ম্যাগনিফাইং গ্লাস নজরে এলো। গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করলে, এটা এখানে কেন ?

— নানি দিয়েছে। নাড়ুকুড়ু বলল।

নানি বললেন, কেন দিয়েছি, সেটা বললে না ?

সব শুনে নানা বিস্ফারিত চোখে নাড়ুকুড়ুকে দেখে বললেন, মশা একটা ক্ষুদ্র উড়ন্ত পতঙ্গ। কী করে সে স্থলচর প্রাণী হয় ?

— কেন হবে না ? ডানা খসে গেলে সে কি আর উড়ন্ত হতে পারে ?

— ছ'টা পাওলা কোনো জন্তু দেখেছিস ?

— ছ'টা পা তুমি কোথায় পেলে ? নাড়ুকুড়ু অবাক। নানাকে উলটে প্যাঁচে বাঁধতে চায় ও। নানা বললেন, মশার ছ'টা পা। কে সেই শল্যচিকিৎসক — যে দুটো পা অপারেশন করে দিয়েছে ?

নাড়ুকুড়ু অনেকক্ষণ ভাবল, আতস কাচ দিয়ে নানাকে একবার দেখাল। বুড়ো কেমন মিচকি মিচকি হাসছে। যেন জিতে গেছে। জেতাচ্ছি —

নাড়ুকুড়ু দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে বলল, যে ভাবে মশার ডানা খসে গিয়েছিল, সেভাবেই দুটো ঠ্যাঙও ভেঙে গিয়েছিল।

— হ্যাঃ, নানার গলায় তাচ্ছিল্য — বড্ড বানানো গপ্পো মনে হচ্ছে না ? ডানা এবং দুটো পা খসে গেলে সে মশা আর বাঁচে ? অতকষ্ট করে যদি বা বাঁচে, সে আর বংশবৃদ্ধি করতে পারে কী ? আধমরাদের দিয়ে কি নতুন প্রজন্ম গড়া যায় বাপ্ ?

নানা উঠে গিয়ে, শেল্‌ফ থেকে একটা মোটা বই এনে মেলে ধরল। এই দেখ, পৃথিবীতে যখন মানুষ ছিল না — সেই কোটি কোটি বছর আগে এই রকম কুকুর ছানার মত ছিল হাতির পূর্ব পুরুষ। একটু একটু করে বড় হতে হতে এখনকার হাতি হয়েছে। ছবিগুলো দেখ ভালো করে।

নাড়ুকুড়ু দেখল ভালো করে। প্রথম ছবিটা অনেকক্ষণ ধরে দেখে, আবার দেখে, মাথা নেড়ে আবার দেখে বলল, তখন শুয়োর ছিল ?

নানা অবাক হয়ে বললেন, শুয়োর ? আমার তো মনে হয় না।

নাড়ুকুড়ু আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলল, ছিল। তুমি জানো না। মশা থেকে না-ও হতে পারে, কিন্তু শুয়োর ছিলই, এই

যে এক্ষুণি কী একটা বিদঘুটে নাম বললে —

নানা বললেন, মোরিথেরিয়াম। এর পরের ধাপে আসবে ফিওমা, যার নাকটা একটু লম্বা হয়েছে, আর চারটে দাঁত বেরিয়েছে। দৈর্ঘ্যে প্রস্থেও একটু বড় হয়েছে, প্রায় একটা বাছুরের মতো। এটুকু হতেই সময় লেগেছে দুশো পঞ্চাশ লক্ষ বছর। এরপর এলো পোলিওমাস্টোডন। সময় গেল আরো একশ লক্ষ বছর। এখন এর চেহারা হল শিং না গজানো গোরুর মত। শুধু নাকটাই যা লম্বা হয়েছে। এর পরে গোম্ফোথেরিয়াম যখন এলো, সে সময়টাকে আমরা বলি মায়োসিন পিরিয়াড়। আজ থেকে প্রায় দুশো পঞ্চাশ লক্ষ বছর আগের কথা। ও অংক তুমি বুঝবে না এখন। উচ্চতা এবং দৈর্ঘ্যে প্রায় পূর্ণ বয়স্ক গোরুর মত। মোটা গোবদা চেহারা, কানগুলোও বেশ বড়ো হয়েছে। নীচের দাঁত আর বড় হয়নি। কিন্তু উপরের দাঁত ফুট খানেক লম্বা হয়েছে। নাক আরো লম্বা হয়ে এখনকার বাচ্চা হাতির মতো হয়েছে।

নানা থামলেন। তারপর নাড়ুকুড়ুর হাঁ মুখের দিকে চেয়ে বললেন, মুখ বন্ধ করো, মশা ঢুকবে।

নাড়ুকুড়ু খেপে গিয়ে বলল, আমি শুয়োরের কথা বলতে চেয়েছি। তোমার ঐ মোরিয়াম, থোরিয়াম, গুম্ফোপডিয়াম, কিছু শুনবো না। অতো সময় ধরে হাতি বানানোর কোনো মানে নেই। আমি বুঝেছি, মশাটা একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়েছে, কিন্তু তোমার মোরিয়মকে দেখে আমি নিশ্চিত ওটার চাইতেও ছোট্ট শুয়োর কোনো ভুল পথে গিয়ে হাতি হয়ে গেছে। মোরিয়মের সঙ্গে শুয়োরের খুব মিল দেখতে পাচ্ছ ? নিজের বুদ্ধি খাটাও। অন্যের গপ্পো বলে মাথা কারাপ কোরনা।

নানা ওর বিশ্বাসকে আরো উস্কে দিতে বললেন, আমি ছোট বেলায় একটা কমিক্স পড়েছিলাম। বানিয়েছিলেন, বিখ্যাত লেখক এবং কার্টুনিস্ট শৈল চক্রবর্তী। তিনি ছবি এঁকে দেখিয়েছিলেন - এরকমটা হতে পারে। ইঁদুর বড় হতে হতে শুয়োর হয়ে গেছে। তাকে বলা হবে মুসাবৃদ্ধি। মুসা মানে ইঁদুর। আবার এ-ও হতে পারে হাতি কোনো কারণে ছোট হতে হতে ক্রমে শুয়োর হয়ে গেছে। একে বলা হবে গজক্ষয়। গজ মানে হাতি।

নাড়ুকুড়ু হাঁ হয়ে থেকে হঠাৎ খুশিতে লাফিয়ে উঠে বলল, আই বাপ্ — এটা তো দারুণ হয়েছে। এটাই সঠিক আবিস্কার।

নানা তবু খুঁত খুঁত করেন। — কিন্তু নাড়ুকুড়ু, হাতি কোথা থেকে এল এবং কখন এল, আর ইঁদুর কখন কোথা থেকে এল — সময়টাতে খুব গোলমেলে রয়ে গেল। মাঝখানে দুদিক থেকে তোমার শুয়োরের বাড়াবাড়ি হয়ে গেল। শুয়োর কি তোমার মুখ্য বিষয় ছিল ?

— না। নাড়ুকুড়ু বলল, আমরা সমস্যা থেকে অনেক দূরে চলে গেছি। মশাকে থাপ্পড় মারব বলেছিলাম। তার গাল খুঁজতে গিয়ে এত বাজে কথা এসে গেল। সমস্যাটা কিন্তু মেটেনি এখনো।

নানা বললেন, তুমি তো কত কত স্বপ্নে ঘুরে বেড়াও। মৌমাছি, প্রজাপতির পেছনে ঘোরো। তেমনি স্বপ্নের মধ্যে ছোট্ট হয়ে গিয়ে একটা মশার গালে থাপ্পড় মেরে এসো। ইচ্ছেপূরণ হয়ে যাবে —

নানাকে খুব সন্দেহের চোখে দেখতে দেখতে নাড়ুকুড়ু ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

---

## আমার ছাতা

### মহাশ্বেতা রায়

লাল-নীল আর হলুদ-সবুজ
আমার ছোট্ট ছাতা —
গ্রীষ্মকালে প্রচুর রোদে
ঠান্ডা রাখবে মাথা।
বৃষ্টি পড়লে ঝম্ ঝমা ঝম্
বাঁচাবে গা মাথা —
নানা রঙের স্বপ্নে ভরা
আমার ছোট্ট ছাতা।
শরৎকালে নরম রোদে
ঠাকুর দেখতে যাব
হঠাৎ বৃষ্টি টাপুর টুপুর
পড়লে, ছাতা খুলব।
হেমন্ত-শীত-বসন্তে ওর
তেমনটি কাজ নেই —
বন্ধ করে গুছিয়ে, তাকের
কোণায় রাখব তাই।
বছর ঘুরে নিয়মমাফিক
গ্রীষ্ম ফিরে এলে
চলব আমি সকাল দুপুর
আবার ছাতা খুলে।
এমনিভাবেই সারা বছর
দিন কংবা রাত্রি,
প্রিয় ছাতাখানি আমার
রঙিন-সহযাত্রী।

# পুরস্কার

## অনন্যা দাশ

ইস্কুলের পিকনিকে এবার নালন্দা যাওয়া হচ্ছে শুনে আর্যনীলের খুব আনন্দ হয়েছিল। বাবার কাজের সূত্রে পাটনায় এসেছে ওরা। সেখানেই একটা ইস্কুলে ভর্তি হয়েছে আর্যনীল। ওর দিদিও সবে একটা কলেজে ঢুকেছে। পাটনা থেকে নালন্দা মাত্র দেড় ঘন্টার পথ কিন্তু ওদের সবার এখনও যাওয়া হয়ে ওঠেনি। তাই ইস্কুল থেকে নিয়ে যাওয়া হবে শোনার পর থেকেই নীল বেশ উত্তেজিত। নালন্দা সম্পর্কে সে অনেক কিছু জানে। তবে সেটা জেনেছে অবশ্য ইতিহাসের বই পড়ে নয়, ওর প্রিয় লেখক শ্রী সাগ্নিক মৈত্রর লেখা "অভিশপ্ত নালন্দা" উপন্যাসটা পড়ে। উপন্যাসটা রহস্য উপন্যাস হলে কী হবে সেটাতে নালন্দার ইতিহাস বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করে আছে। কল্পনার সঙ্গে বাস্তবকে মিলিয়ে দেখতে পারবে ভেবেই ভাল লাগছিল নীলের।

যথা সময় বাসে চড়ে রওনা হল ওরা। সবার পরনে সাদা জামা আর গাঢ় নীল প্যান্ট। টিচাররা বলে দিয়েছিলেন পরিষ্কার জামাকাপড় পরে আসতে। ওদের ইস্কুলের একটা সুনাম আছে চারিদিকে, সেটাকে বজায় রাখার চেষ্টা করা হয় সব সময়। বাস সাঁ-সাঁ করে এগিয়ে চলল গন্তব্যের দিকে। যেটা সমস্যা সেটা হল এক বাস ভর্তি ছেলেপিলেকে সামলানর জন্যে রয়েছেন মাত্র দুজন টিচার। নীলের মতন অন্য ছেলেদের নালন্দার প্রতি কোন আগ্রহ নেই। বাসের ভিতর হইচই মারামারি লেগেই রয়েছে ! খুব রাগ হচ্ছিল নীলের, এরা কী রকম রে বাবা ! এমন একটা দারুণ জায়গায় যাচ্ছে কিন্তু কারো কোন উৎসাহ নেই। ওদের কিনা মারামারি ঝগড়া করার ইচ্ছে বেশি ! যাক কী আর করা যাবে, ওরা যা করছে করুক, ভেবে নীল পিঠের ব্যাগটা থেকে "অভিশপ্ত নালন্দা" বইটা বার করে ফেলল। নালন্দা সম্বন্ধে তথ্য বেশির ভাগ চীনদেশের পরিব্রাজক হুয়েন সাংয়ের লেখা থেকে জানা যায়। উনি তিন বছর ছিলেন নালন্দায়। তখন সেখানে দশ হাজার ছাত্র আর প্রায় দুহাজার শিক্ষক ! নালন্দা যে পৃথিবীর সর্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয় সেটা সবাই এক কথায় স্বীকার করে।

বইটা পড়তে পড়তে এত বিভোর হয়ে পড়েছিল নীল যে খেয়ালই করেনি কখন ওদের বাস থেমে গেছে।

"এই নীল নামবি না ? খুব তো নালন্দা নালন্দা করছিলি আর এখন যখন পৌঁছে গেছি

তখন আর তোর বাস থেকে নামর ইচ্ছেই নেই দেখছি !" রোহিত ফোড়ন কাটল।

রোহিত ভাল ছেলে নয়। পড়াশোনায় তার মন নেই, সব সময় ঝগড়া, মারামারি বা বদ কিছু করছে তাই ওর কথায় কান না দিয়ে উঠে পড়ে বইটাকে ব্যাগের ভিতর ঢুকিয়ে ফেলল নীল। বাস থেকে নেমে লাইন করে এগিয়ে চলল ওরা সবাই। গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকেই প্রথমেই ভারতীয় পুরাতত্ব বিভাগের বড় একটা সাইনবোর্ড আর চারিদিকে দেখা যাচ্ছে ইঁটের তৈরি স্থাপত্য !

নীল একটা শিহরন অনুভব করল লাল ইঁটের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে। সব কিছু কী প্রকান্ড। প্রতিটি ভবন ন'তলা সমান উঁচু ছিল। ৪৫০ খৃষ্টাব্দে ওরা যে এই রকম ইঁট তৈরি করতে পারত সেটা ভাবলেই কেমন আশ্চর্য লাগছিল। টিচার ওদের হিউয়েন সাংয়ের ঘর আর প্রার্থনা কক্ষ দেখালেন। ঠিক হলফ করে তো বলা যায় না অত দিন আগের ব্যাপার তো, তবে আন্দাজ করা হয় ওটাই ওনার ঘর ছিল। সাধারণ ছাত্রদের ঘরে একটা বা দুটো করে বেদির মতন করে বাঁধানো বিছানা। ১৯৯৩-১২০০ খৃষ্টাব্দে বক্তিয়ার খিলজি dÆংস করে ফেলে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়কে। বহু বৌদ্ধ ছাত্রদের মেরে ফেলা হয়। মহামূল্য পুঁথিতে ঠাসা বিশাল লাইব্রেরি ছিল। সেই সব পুঁথি ওরা পুড়িয়ে ফেলে। শুধু পুঁথি পোড়াতেই নাকি ছ'মাস লেগে গিয়েছিল ওদের। ৮০০ বছরের গবেষণার ফসল সব পুড়ে ছাই।

"তিîতের এক পরিব্রাজক স্বামী নালন্দার সংহার নিয়ে খুব রোমহর্ষক বৃত্তান্ত লেখেন। নালন্দা dÆংসের বিবরণ ওনার লেখা থেকে ভাল পাওয়া যায়," ইতিহাসের পাঠক স্যার বললেন।

ক্লাসের অন্য ছেলেগুলোও মন দিয়েই সব শুনছিল এবং তাদেরও ভাল লাগছিল বলেই মনে হল। ওদের স্কুলের দলটা এগিয়ে গেল কিন্তু একটা বড় চৈত্যের (প্রার্থনা কক্ষ) সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল নীল। মোহিত হয়ে দেখছিল কারুকার্যগুলোকে। আশেপাশে প্রচুর লোক। বিদেশিও রয়েছে কয়েকজন। যদিও আগ্রা বা রাজস্থানে যত বিদেশিদের দেখা যায় এখানে তার এক শতাংশও নেই দেখে একটু অবাকই লাগছিল নীলের। একজন হাফপ্যান্ট পরা বয়স্ক বিদেশি ভদ্রলোক মন দিয়ে ছবি তুলছিলেন। ওনার ক্যামেরাটাতে হরেক রকমের লেন্স বদলে বদলে লাগাচ্ছিলেন। ওনার সঙ্গে আসা বিদেশিনী মহিলা আবার সালোয়ার কামিজ পরেছিলেন। চৈত্যগুলোর যে সব কারুকাজ নীলের মনে ধরেছিল সেগুলোর বেশ যত্ন সহকারে ছবি তুলছিলেন ভদ্রলোক। নীলের কাছে ক্যামেরা নেই। সে মনে মনে ঠিক করে পরের বার যখন মা-বাবা-দিদির সঙ্গে আসবে তখন বাবার ক্যামেরাতে অনেক ছবি তুলবে।

এই সব সাত পাঁচ ভাবছে নীল এমন সময় ঘটনাটা ঘটে গেল। বয়স্ক ফটোগ্রাফার ভদ্রলোক পিঠের ব্যাকপ্যাকটা নীচে নামিয়ে ছিলেন কয়েক মুহূর্তের জন্যে, ওমনি রোহিত কোথা থেকে ঝাঁ করে ছুটে এসে, "এই বুড়্ঢা, এখানে কী করতে এসেছিস এখানে একদম ছবি তুলবি না !" বলে ভদ্রলোককে ঠেলে ফেলে দিয়ে ওনার ব্যাগটা তুলে নিয়ে পালালো।

রোহিতের পাজি সাঙ্গপাঙ্গগুলোও "বুড়্ঢা বুড়্ঢা" বলে কয়েকবার চেঁচিয়ে ছুট দিল। ভদ্রলোক মাটিতে পড়ে গিয়ে অসহায় ভাবে তাকিয়ে রইলেন ওদের দিকে।

লজ্জায় কান লাল হয়ে গেল নীলের। ওর স্কুলের, ওর ক্লাসের ছেলেরাই কিনা ওই রকম করল ! পাঠক স্যার আর অন্য টিচারই বা কোথায় ?

ততক্ষণে আশেপাশের অন্য লোকজনেরা ভদ্রলোককে টেনে তুলেছে। নীল দেখল, নাহ, একটা কিছু করা উচিত। সে এগিয়ে ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে বলল, "স্যার, আমার ক্লাসের ছেলেরা আপনার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে তার জন্যে আমি লজ্জিত। ওদের ওই আচরণের জন্যে আমি ক্ষমা চাইছি। নালন্দা আমাদের দেশের অমূল্য সম্পদ। আপনারা যে দূর দেশ থেকে উৎসাহ আর আগ্রহ নিয়ে সেটা দেখতে এসেছেন সেইজন্যে আমরা কৃতজ্ঞ। আপনার ব্যাগটা আমি নিয়ে আসছি, আপনি একটু অপেক্ষা করুন !"

ভদ্রলোক ওর কথা শুনে বেশ খুশি হলেন মনে হল। ওনার সবুজ চোখে একটা ঝিলিক খেলে গেল উনি যখন বললেন, "থ্যাঙ্ক ইউ মাই বয় আমি সুদূর ফ্রান্স থেকে আসছি এটা দেখার জন্যে এবং এই ঘটনাটা ছাড়া নিরাশ হইনি !"

নীল আর দাঁড়াল না। ওকে ব্যাগটা উদ্ধার করতে হবে তো। কী ভাবে সেটা করবে কে জানে। মারামারি ঝগড়াঝাটি ওর তেমন আসে না। যেতে যেতে ও শুনতে পেল ভদ্রলোক বলছেন, "মনুষ্যত্বের প্রতি আমার ধারণা বেশ আঘাত পেয়েছিল ওই ঘটনাটায় কিন্তু ওই বাচ্চা ছেলেটাকে ধন্যবাদ এখন সেই আঘাতটাকে কাটিয়ে উঠতে পারব।"

কথাটা শুনে মনটা জুড়িয়ে গেল নীলের। এখন ব্যাগটা পেলেই শেষরক্ষা হয়ে যায়, ভেবে বিশাল স্নানাগারটার পাশ দিয়ে এগিয়ে চলল সে।

" শুনলাম তুই নাকি ওই বুড়ঢাকে সরি বলেছিস !

তোর কি মেরুদন্ড বলে কিছুই নেই ?" রোহিত হঠাৎ উদয় হয়েছে ওর সামনে !

"ওনার ব্যাগটা ফেরত দিয়ে দে রোহিত ! উনি বিদেশি, ফ্রান্স থেকে এসেছেন। তুই ওই রকম করলি, এখন আমাদের সম্পর্কে, উনি কী রকম ধারণা নিয়ে দেশে ফিরবেন বল তো !"

"তোকে আর উপদেশ দিতে হবে না ! বেশ করেছি ব্যাগ নিয়েছি ! সাকেত বলছিল লোকটা গেটের বাইরে ভিখিরিদের ছবি তুলছিল ! সেই সব নিজের দেশে নিয়ে গিয়ে দেখাবে ব্যাটা !"

"তাতে কী ? ভিখিরি সব জায়গাতেই আছে। আমার কাকু নিউ ইয়র্কে থাকেন, উনি বলেন ওখানেও নাকি প্রচুর ভিখিরি আছে। উনি ছবিও দেখিয়েছেন আমাদের। নে এবার ব্যাগটা দে !"

"দেব না যা ! কী করবি তুই ?" বলে রোহিত বাঁ হাতে একটা ঘুসি চালাল।

নীল তো এক ঘুসিতেই কাৎ। মাটিতে পড়ে গেল সে। শক্ত ইঁটের মাটিতে পড়ে ভালই ব্যথা লাগল।

"রোহিত, আর্যনীল কী হচ্ছে এটা ! তোমরা এত বড় হয়ে গেছ তাও আমাদের দুদন্ড শান্তিতে থাকতে দেবে না দেখছি।" পাঠক স্যার কোথা থেকে উদয় হয়েছেন।

অন্য শিক্ষকও যোগ দিলেন, "ছি, ছি আর্যনীল, আমি তো ভাবতাম তুমি ভাল ছেলে আর তুমি কিনা এখানে মারপিট করছ !"

"আমি তো ঝগড়া করতে চাইনি, কিন্তু রোহিত ওই ফরাসি ভদ্রলোকের ব্যাগটা দিতে চাইছে না যে !" নীল কাঁচুমাচু মুখে বলল।

"কী ব্যাগ ?" পঠাক স্যার জিজ্ঞেস করলেন।

সব কিছু শুনে দুজন শিক্ষকই খুব রেগে গেলেন। ব্যাগটা নিয়ে যখন চৈত্যের কাছে গেল ওরা সবাই তখন দেখা গেল আর ভদ্রলোক সেখানে নেই। ব্যাগে অবশ্য কয়েকটা জলের বোতল আর দুয়েকটা টুকটাক ক্যামেরার সরঞ্জাম ছাড়া কিছুই নেই বলেই মনে হয়। ভদ্রলোক ওটাকে ছেড়ে দিয়ে চলে যাওয়ার মনস্থ করেছেন। তাও ব্যাগটা ফেরৎ না দিতে পেরে মনটা খারাপ হয়ে গেল নীলের। ফেরার সারাটা পথ শরীর আর মনের ব্যথাগুলো চিনচিন করতে থাকল।

সোমবার দিন প্রিন্সিপালের অফিসে ডাক পেতে আশ্চর্য হল না নীল। পাঠক স্যার তো বলেইছিলেন পুরো ঘটনাটা প্রিন্সিপালকে জানাবেন। দরজায় টোকা দিয়ে ভিতরে যাওয়ার অনুমতি চাইতেই ওকে নাম ধরে ভিতরে আসতে বললেন প্রিন্সিপাল স্যার। ঘরে ঢুকে অবশ্য বেশ চমকে গেল নীল কারণ প্রিন্সিপালের ঘরে আরেকজন বসে রয়েছেন ! ফ্রান্স থেকে আসা নালন্দায় দেখা সেই ভদ্রলোক ! ব্যাগটা ওনার হাতে ফিরে গেছে।

নীলকে দেখে উনি বললেন, "তোমার সঙ্গে আবার দেখা হয়ে খুব ভাল লাগছে !" বলে ওর সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন।

প্রিন্সিপাল স্যার বললেন, "তুমি শুনলে খুশি হবে যে মিস্টার লুই পিয়ার আমাদের স্কুলের কম্পিউটার ঘরের জন্যে আরো দশটা কম্পিউটার দিচ্ছেন !"

মিস্টার পিয়ার তার সবুজ চোখে ঝিলিক দেওয়া হাসি হেসে বললেন, "আমি সেই উদ্দেশ্য নিয়েই এখানে এসেছিলাম। একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটায় আমি কিছুক্ষণের জন্যে মত পরিবর্তন করেছিলাম বটে কিন্তু তোমার ব্যবহারে আমি আমার আগের সিদ্ধান্তে ফিরে আসছে পেরেছি। আশাকরি তোমার আঘাত সেরে গেছে।"

নীল কী বলবে বুঝতে না পেরে শুধু মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। এরপর ভদ্রলোক পকেট থেকে একটা বিদেশি চকোলেট বার করে ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "নালন্দার মাটিতে গড়ে ওঠা এক মিষ্টি বন্ধুত্বর স্মৃতি হিসেবে আশা করি এটা নিতে তোমার আপত্তি হবে না !"


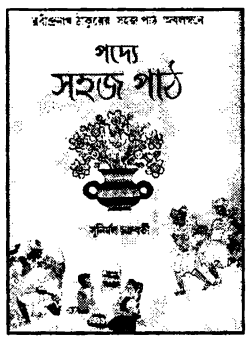


**পদ্যে সহজ পাঠ**

সুনির্মল চক্রবর্তী

**রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহজ পাঠ অবলম্বনে**

কবি ও শিশুসাহিত্যিক সুনির্মল চক্রবর্তী সহজ পাঠ-এর অনুপম গদ্য রচনাগুলিকে কবিতায় রূপান্তরিত করেছেন মূলের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে। রবীন্দ্রনাথের অসামান্য রচনাগুলিকে কোথাও লঘু করেননি তিনি। ফলে সহজ পাঠ-এর সৌন্দর্য ও শুচিতা রক্ষা পেয়েছে। পদ্যে সহজ পাঠ-এর এই সংস্করণের ছবি এঁকেছেন এ যুগের প্রখ্যাত শিল্পী সুব্রত চৌধুরী। তাঁর আঁকা ছবিগুলি পদ্যে সহজ পাঠ-এর আকর্ষণ আরও বাড়িয়েছে বলাই যায়।

**পারুল প্রকাশনী**

**৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা - ৯**

**মূল্য - ১০০.০০ টাকা**

গল্প

# রামু নামের ছেলেটা

## সাগরিকা রায়

অনেক দূরে ঘুম পাহাড়ের ধারে একটি ছেলে থাকতো। সে মোটে লিখতে পড়তে চাইতো না। তার মা কত বোঝাতো, তবু সে সারাক্ষণ বসে বসে নানারকম অদ্ভুত ভাবনা ভাবতো। ওদের ছোট্ট কুঁড়ে ঘরে শীতের সময় সনসন ঠান্ডা বাতাস বইতো। ও ভাবতো, যদি এখন একটা মোটা সোটা কম্বল পাওয়া যেত ! যদি পাহাড়ের উপরে যে পরিরা থাকে, তারা ওকে কম্বলটা দিয়ে যেত ! আহা হা, কী আরাম যে হতো রে ভাই ! কিন্তু শুধু ভাবলেই কি আর সব হয় ? ওর মা তাই বলতো – পড়া শেষ করে কোথাও চাকরি করে কম্বল কিনে আনতে হবে। কেউ ঘরে এসে কিছু দিয়ে যাবে না। একদিন মা আর বাবা মিলে ওকে খুব বকাবকি করেছে। ছেলেটা ভাবল— ধুর, এরা শুধু খিচমিচ করে। এর চে কোথাও চলে যাই। বলে সবাইকে লুকিয়ে ছেলেটা বনের ধারের সরু রাস্তা দিয়ে অন্য কোথাও যাবে বলে রওনা হল। যাওয়ার সময় বেশ ভালই লাগছিল। ফুরফুরে বাতাস বইছে। পাখি উড়ছে, প্রজাপতি ফুলের উপর গিয়ে বসছে। দেখে টেখে ওর খুব ভাল লাগছিল। অনেকটা পথ গিয়ে একসময় দিন শেষ হয়ে এল। সন্ধে নেমে আসছে। শীতের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। তখন ওর মনে হল, ইস, যদি আমার চাদরটা নিয়ে আসতাম ! এখন কেউ যদি এসে আমাকে একটা খুব গরম জামা দিয়ে যেত! কিন্তু কিছুই হলনা। কেউ এলনা তাকে সাহায্য করতে। ছেলেটা ভাবল, মার কাছে থাকলে মা আমাকে গরম জামা, মোজা পরিয়ে দিত। আমাদের সোনামণি গরুর গরম দুধ খেতে দিত। এখন মা নিশ্চয় রামু , রামু বলে আমাকে খুব ডাকছে। বাবা পড়শিদের ঘরে ঘরে গিয়ে আমার খোঁজ করছে ! সেবার যখন স্কুল থেকে ফিরে আসতে দেরি হয়েছিল, বাবা নিজে ভিজে বাড়ির একটিমাত্র ছাতাটা নিয়ে আমাকে স্কুল থেকে নিয়ে আসতে গিয়েছিল। কিন্তু এখন

আমি কী করবো ? বাড়ি অনেক দূরে ফেলে এসেছি। এই অন্ধকারে ফিরে যেতে পারবো না ! যদি এখানে বুনো জন্তু থাকে ? আমাকে যে মেরে ফেলবে আমাদের চুকাই নামের ছোট্ট বেড়ালছানাকে যেভাবে মেরে ফেলেছিল। তার চে সামনের দিকেই ছুটতে থাকি। বলে রামু ছুটতে ছুটতে অন্ধকারে কোথায় যে চলে এসেছে বলতে পারবে না। চারধারে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। সামনে পেছনে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। দু'পাশে বড় বড় গাছ। ভূতের মত তাদের দেখতে লাগছে এই আঁধারে ! যেন এখনই হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলবে ওকে। ভয় যেমন লাগছে, খিদেও পেয়েছে ওর। সেই কখন দুপুরে ভাত খেয়েছিল আলুপোস্ত দিয়ে। এখন পেটের মধ্যে ডাম ডাম বাজনা বাজছে। খিদের বাজনা ! আর কি হু হু হাওয়া রে বাবা ! কাঁপতে কাঁপতে রামু এক জায়গায় এসে দাঁড়াল। আচ্ছা, ওই যে দু..রে, একটুখানি আলো দেখা যাচ্ছে না ? মনে হচ্ছে ওখানে মানুষ আছে। ঠিক আছে। ওখানেই যেতে হবে রামুকে। দৌড়তে দৌড়তে একসময় সেই আলোর কাছাকাছি এসে রামু দেখে কী, একটা ছোট বাড়ি। ভেতরে একটা কেউ আছে। তার গানের গলা পাওয়া যাচ্ছে। ভাঙা ভাঙা গলায় সে গান গাইছে। রামু ভাবল এটা গল্পে পড়া ডাইনি বুড়ির বাড়ি নয়তো ? কিন্তু স্কুলের স্যার বলেছেন ডাইনি বলে কিছু নেই। ছেলেধরা ? সেটা তো আছে। যদি রামুকে ধরে ভিখিরি বানিয়ে রাখে ?

না, আগেই সামনে যাবেনা রামু। আড়াল থেকে দেখাই যাক, এখানে কে থাকে ! এই ভেবে রামু অন্ধকারেই বাড়িটার পেছন দিকে গিয়ে কান পেতে দাঁড়িয়ে রইল। এমন সময় কী সুন্দর একটা গন্ধ বের হল রে ভাই ! খিচুড়ির গন্ধ। এই বাড়িতে এই ঠান্ডার দিনে গরম গরম খিচুড়ি রান্না হচ্ছে ! ওহ, রামু খিদে চেপে খিচুড়ির গন্ধ শুঁকে যাবে ? মোটেই না। রামু আস্তে আস্তে উঁকি দিয়ে ঘরের ভেতরটা দেখল জানালার একটুখানি ফাঁক দিয়ে। দেখে, একটা বুড়ি গান গাইতে গাইতে দাউ দাউ উনুনের সামনে বসে খিচুড়ি রাঁধছে। রান্না বোধহয় হয়ে এসেছে। বুড়ি থালায় খিচুড়ি ঢেলে নিল · সুপসাপ শব্দ করে খাচ্ছে দেখ ! ইস, আবার হাত চাটছে ! একি, বুড়ি কি সবটুকু খেয়ে ফেলবে ? না মনে হয়। কিছুটা আছে নিশ্চয়। সব কী আর খেতে পারে মানুষ ? একটু তো থাকবেই। ভাবে রামু। খেয়েদেয়ে, হাতমুখ ধুয়ে বুড়ি পাশের ঘরে ঢুকে পড়ল। শোবে বলে। কিন্তু এই ঘরে তো ছিটকানি দিলনা ! না দিলেই ভালো। রামু ঠান্ডার মধ্যে চুপ করে বসে থাকে। একটু পরেই বুড়ির ঘর থেকে নাক ডাকার আওয়াজ পাওয়া গেল। তখন রামু চুপি চুপি ঘরে ঢুকে খিচুড়ির হাঁড়ি থেকে খিচুড়ি বের করে খেতে থাকল। খুব বেশি তো আর ছিলনা, কিন্তু রামুর পেট ভরে গেল। ওর এই গরম উনুনের ধারে ভারি আরাম হতে ও ওখানেই শুয়ে পড়ল। কী ঘুম ! কী ঘুম !

পরদিন সকালে বুড়ি অবাক। ও মা ! এটা কে রে ? আমার বাকি খিচুড়ি কোথায় গেল ? ঘুম ভেঙে রামু কাঁদো কাঁদো - আমাকে মেরোনা গো। বড্ড খিদে পেয়েছিল.. তাই। বুড়ি খুব রেগে গেল — কেমন ছেলে তুই ? কাজ করিসনা, কর্ম করিসনা। আজ থেকে আমার গরুটাকে ঘাস খাওয়াবি ওই মাঠের ধারে। আর আমার উঠোনে লঙ্কা চারা, উচ্ছে চারা লাগিয়েছি। দেখভাল করবি। শুধু খিদে পেলে চলবে ?

ব্যস, সেদিন থেকে রামুর কাজ করার দিন শুরু হল। সারাদিন কাজ, রাতে গান গেয়ে খিচুড়ি রান্না করে খাওয়া। রাতে বুড়ির বিছানার পাশে ছোট চৌকিতে পুরনো কম্বল গায়ে দিয়ে ঘুম ! কী যে সুখ !

একদিন লঙ্কা গাছে লঙ্কা হল, উচ্ছে গাছে উচ্ছে হল। সব নিয়ে অনেক দূরের পাহাড়ের কোলের হাটে বেচতে গেল রামু। বুড়ির সঙ্গে। ফেরার সময় ঝাল চানা কিনে দিল বুড়ি। আজ ভালই বিক্রি হয়েছে।

তারপর একদিন বুড়ি ওকে নিয়ে তার বোনের বাড়ি বেড়াতে গেল। রামুর খুব ইচ্ছে করছিল মা বাবাকে দেখতে। কিন্তু বুড়ি খুব রাগী। তাকে কিছু বলতে পারেনা রামু। অনেক দূরের গাঁয়ে বোনের বাড়ি যাবে বলে বুড়ি ভারী খুশি। ঘরে তৈরি আচার, আর কিছু উচ্ছে নিয়ে যাচ্ছে সে। ঘর বন্ধ করে যাচ্ছে। যেতে যেতে রামুর সঙ্গে গল্প করতে করতে যাচ্ছে। রামুও অনেকদিন পরে বাইরে বেরিয়ে খুশি। কিন্তু বাড়ির কথা যে বড্ড মনে পড়ছে ! দুঃখের কথা বুড়ির কাছে ছাড়া কার কাছেই বা বলে রামু ?

হেঁটে হেঁটে যেখানে এল ওরা, জায়গাটা বেশ চেনা চেনা ! কোথায় এল ওরা ? দূরে একটা ছোট কুঁড়ে দেখা যায়। ওটা রামুদের বাড়ির মতোই দেখতে। বুড়ি জোরে হাঁক পাড়ে - ও রামুর মা, দেখ, কাকে নিয়ে এসেছি গো !

বলতেই সেই কুঁড়ে থেকে ছুটে বেরিয়ে এল রামুর মা, বাবা ! ইস, কী চেহারা হয়েছে দুজনের ! রামুর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। মাগো, আমি ফিরে এসেছি ! বুড়ি হেসে সারা — এখন তোমাদের রামু কাজে কর্মে খুব দড় হয়েছে। আজ গল্পে গল্পে ওর থেকে তোমাদের সম্পর্কে জেনে নিয়ে এখানে চলে এলাম। আমার কোনও বোন নেই। সব বানিয়ে বলা। হি হি করে হাসে বুড়ি - তবে একা থাকি, রামু আমার কাছে থাকলে কি রাগ করবে ? যদিও আমি তোমার বোন নই।

রামুর মা, বাবা খুব রাজি। রামুকে মানুষ করে দিয়েছে যে, সে রামুর মায়ের বোন নয়তো কী ?

## মরুভূমি

### বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায়

সূর্যিটাকে আড়াল করে উঠছে বহুতল
স্নিগ্ধ আলো কোথায় পাবে তুমি ?
লোপাট হলো শিশুর খেলার মাঠ
বুজছে পুকুর এবং জলাভূমি।
ব্যবসা বাড়ুক, আসুক আরও টাকা
লাফিয়ে চলুক মুনাফা, কারবার।
প্রগতি আজ সিন্ডিকেটের চাকা
জোরসে ঘোরাও তোমরা প্রোমোটার।
সভ্যতা কি লোহা ও কংক্রিটে
বাঁধানো এক আস্ত ফটোফ্রেম ?
সেখানে নেই রাখাল ছেলের বাঁশি
সেখানে নেই পাখ পাখালির প্রেম।
উদার আকাশ থমকে আছে দূরে
ঝর্ণাধারা খুঁজছ কোথায় তুমি ?
দিগন্তময় খাঁচার সারি সারি
ক্লান্ত হতাশ ইটের মরুভূমি।

## বিবর্তন

### সুপ্রকাশ আচার্য

পাঠ তো এখন সহজ নয়
পাঠশালা হল বিদ্যালয়,
বর্ণ কাননে পরিচয়হীন ফুল
ধারাপাত সুর দোলেনা দোদুল দুল।
ছোট নদী চলে কেবলি বাঁকা
জলছবি নেই মননে আঁকা।
ভোরের পাখিটি ঘুম ভাঙানিয়া গায়না,
ছোটদের কাছে বড়দের বাড়ে বায়না।
বনস্পতির আশায় আশায়
টবে চারা পুঁতে পাই বনসাই,
সময়ের সাথে তাল মেলাতেই সন্ধ্যা
ছন্দ হারিয়ে শৈশব আজ বন্ধ্যা।
রূপকথা শোনে ঘুমের দেশ
কল্প লোকের স্বপ্নাবেশ,
ইঁদুর দৌড়ের ক্লান্ত তেপান্তরে
শিশুর ইচ্ছে পক্ষীরাজটি ওড়ে।

## এবার পুজোয়

### অংশুমান চক্রবর্তী

এবার পুজোয় বৃষ্টি হলে — দুশ্গা ঠাকুর, করবো আড়ি
আমরা ঘরে থাকবো বসে, পাঠিয়ে দেবো তোমায় বাড়ি।
নতুন জামা, নতুন জুতো, আলমারিতে রাখবো তুলে
বাইরে গেলেও রাখবো না চোখ কাশের বনে, শিউলি ফুলে।
অনেক কিছুই পারো তুমি, পুজোয় যেন বৃষ্টি না হয়
বলে দিও বৃষ্টিটাকে — ঝরুক এবার অন্য সময়।
বৃষ্টি যদি না হয় তবে সবাই মিলে উঠব মেতে
পরবো সবাই নতুন জামা, দেখবো ঠাকুর প্যান্ডেলেতে।

## খুশির ডাক

### তপোন দাশ

ভোর না হতেই জানলা থেকে মারছে উঁকি আলো,
কে যেন আজ বলছে আমায় গন্ধ সুধা ঢালো।
আকাশেতে নীলের ভেলায় যাচ্ছে কারা দূরে,
নদীর বুকে নৌকা চলে ভাটিয়ালির সুরে।
রোদের ঝিলিক গাছের ফাঁকে শিউলি পড়ে ঝরে,
নানা রকম আলপনা আজ দিচ্ছে সবাই দোরে।
কাশ ফুলেরা দুলিয়ে মাথা আনছে খুশির ডাক,
হাওয়ার তালে আসছে কানে বাজছে পুজোর ঢাক।

## রূপের বাহার

### উপাসনা পুরকায়স্থ

ফুল ফল আর আকাশের গান রূপকথা হয়ে ফোটে
বাতাসেরা যদি গান জুড়ে দেয় অবাক হয়ো না মোটে।
দোল খায় এক বাবুইয়ের ছানা বাতাবি লেবুর গাছে
নদী খুশি খুশি হাত তালি দিয়ে ডাকে — আয় দেখি কাছে।
শালুক পুকুর টলমলে জল কিত কিত খেলে কবি
গাছের পাতায় বৃষ্টির ফোঁটা আঁকে কত কী যে ছবি।
চাঁদ ঝুলে থাকে পূবের আকাশে মিটমিট করে তারা
জোনাকি পোকারা আলো জ্বেলে ফেরে ঘুমিয়ে রয়েছে পাড়া।
উদাসি বাউল একতারা হাতে গায় — জীবনের গান
রোদের সোনায় রূপের বাহার মন করে আনচান।

গল্প

# আজব গাঁয়ের গুজব

## শুভ্রা ভট্টাচার্য

এক গ্রামের গল্প বলি। নাম আজব গ্রাম। সেই গ্রামে ছিল একটা সুন্দর ছোট্ট নদী। সে নদীর পাড়ে বহু বছর ধরে ডালপালা বিস্তার করে ছিল এক অতিকায় বেলগাছ। আর সেই বেলগাছে থাকতো একটা বেঁটে ব্রহ্মদত্যি। একদম থুত্থুড়ে বুড়ো। তার মাথা জোড়া টাক, বেঁটে বেঁটে পা। গলায় মস্ত এক পৈতে জড়ানো। বড় ভালো মনের ভূত। গ্রামের মানুষ জনকে কোনও দিনও ভয় দেখাতো না। ঘাড়ও মটকাতো না। তবে তার কোনও সঙ্গী সাথি ছিল না। একা একাই আপন মনে গুড়গুড়িয়ে হুঁকো টানত আর গাছের পাকা বেল খেত। পাশেই ছিল একটা লম্বা তাল গাছ। তাল গাছটা এতই লম্বা যে বেঁটে তার নাগাল পেতো না। তাই নিয়ে তার মনে ভারী খেদ ছিল।

একদিন হল কী, বামুন সন্ধ্যাবেলায় বেলগাছে বসে পা দুলিয়ে হুঁকো খাচ্ছিল। এমন সময় হঠাৎ তাল গাছের পাতাগুলি থর থর করে কেঁপে উঠলো। ব্রহ্মদত্যিমশাই ভূত হলে কী হবে, আদতে ছিল খুব ভীতু প্রকৃতির। এই ভর সন্ধ্যের অন্ধকারে গ্রামের রাস্তায় একটিও লোক নেই। সন্ধ্যে নামার আগেই লোকজন যে যার ঘরে ফিরে যায়। এমনই নির্জন পরিবেশে ঘুটঘুটে অন্ধকারে কোথাও হাওয়া চলছে না তবু তালগাছের পাতা নড়ছে, কার না পিলে চমকায় শুনি? ব্রহ্মদত্যি কান খাড়া করে শুনল, আবার খস খস পাতা নড়ল যেন। সে তো ভয়ে অস্থির। কাঁপতে কাঁপতে রাম নাম জপ আরম্ভ করল। যেই না রাম নাম জপা ওমনি তাল গাছের মাথা থেকে টুপ করে একটা তাল খসে পড়লো। মাটিতে পড়েই সেটা গড়াগড়ি খেতে লাগলো। হঠাৎ হল কী সেটা একটা ইয়া লম্বা কালো কুচকুচে ছায়ায় বদলে গেলো। সেটার লম্বা লম্বা হাত, ঝাঁটার কাঠির মতো সরু সরু লম্বা লম্বা ঠ্যাং, মস্ত দুটো কান, চারটে মোটা মোটা মুলোর মতো দাঁত। হাত জোড় করে খ্যান খ্যান গলায় কেঁদে কেটে বললে,

— দয়া করেন হুজুর। আর রাম নাম নিবেন না। আমি গরিব মামদো। নিজের পাড়া থেকে তাড়া খেইয়ে এইকেনে এসেছি। তাইড়িয়ে দিলে কোই যাবো বাবু ?

মামদোর চেহারা দেখে তো বামুনের ভিরমি খাওয়ার উপক্রম। তা কোনও মতে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, রাম নাম নেব না ? ব্যাটা আহাম্মক। জানিস আমি নরেন বাড়ুজ্জ্যে পণ্ডিত।

এই দ্যাখ আমার পৈতে। আর তোর ঐ পিলপিলে চেহারা নিয়ে এসেছিলিস আমাকে ভয় দেখাতে ?

সঙ্গে সঙ্গে জিভ কেটে মামদো বলল, ইলললল। । হুজুর কী কন ? আমি আপনেকে ভয় দেখাবো সেই খ্যামতা আমার নেই হুজুর। আপনি হলেন বাম্মন মানুষ বড়লুক, আর আমি মামদো ছোটোলুক।

— ইইইই। মামদোবাজি ? আমার সঙ্গে ?

— না না হুজুর। বাজে নই, আমি ছোটোলুক বটে। কিন্তু সাচ্ছা লুক আছি বাবু।

– বটে ? তা বুঝবো কীভাবে যে তুই সাচ্চা লুক বটে ?

— আজ্ঞে অপরাধ নিবেন না হুজুর। আমি আপনের কোনও অসুবিধেও করবো নে। আপনি যা বলবেন তাই করে দেবো। শুধু আমাকে এই গাছ থেকে তাইড়ে দিবেন না হুজুর। তাইড়ে দিলে আমি কুন খানে যাবো হুজুর ?

এই বলে সে হাউহাউ করে কেঁদে উঠলো। মামদোর কান্না দেখে বামুনের দয়া হল। ভূত হলে কী, ব্রহ্মদত্যি মানুষ তো, তাই দয়ার শরীর। সে তখন সুর নরম করে বললে, আচ্ছা ঠিক আছে, কাঁদিস না তুই। কান্না কাটি আমি বড় সইতে পারিনা বাপু। তুই থাক। ওই তাল গাছেই থাক। কিন্তু আমারও একটা শর্ত আছে।

থাকার অনুমতি পেয়ে মামদো তো বেজায় খুশি। সে একেবারে বামুনের পা জড়িয়ে ধরে গদ গদ স্বরে বললে, আপনি যা বইলবেন কইরে দেবো হুজুর। আপনের দয়ার শরীল। আপনে শুধু বলেন দিকি কী করতে হবে। আমি এখুনি কইরে এনে দিচ্ছি এই আপনের পায়ের তলায়।

– বেশ বেশ । তুই তবে আমাকে তোর গাছ থেকে একটা বেশ পাকা তাল পেড়ে এনে খাওয়া দেখি কেমন পারিস। কত কাল যে তাল খাইনা। এদ্দিন ধরে এগুলো চোখে দেখছি অথচ নাগাল পাইনা বলে একটু চেখে দেখতে পেলুম না কোনোদিন। দে দেখি একটা খেয়ে দেখি।

– ব্যা-অ্যা-অ্যা-স। এই টুকুন কতা কর্তা ? এই এখুনি এনে দেই।

এই বলে সে করলো কী তার সম্বা হাত দিয়ে তাল গাছের মাথা থেকে টুক করে একটা পাকা তাল পেড়ে এনে ব্রহ্মদত্যির পায়ের কাছে রাখলো। ব্রহ্মদত্যি তো বেজায় খুশি। ব্রহ্মদত্যিকে খুশি করে মামদোও তাল গাছে তার বাসা খানি পাকাপাকি করে ফললো। চুক্তি হল মামদো রোজ একটা করে পাকা তাল এনে ব্রহ্মদত্যি মশাইকে খাওয়াবে। একটা গাছের তাল শেষ হয়ে গেলে সে অন্য গাছ থেকে পেড়ে এনে খাওয়াতো। এমনি করে একদিন গ্রামের সব তাল গাছের তাল শেষ হয়ে গেল। পাকা তালের খোঁজে মামদো পাশের গ্রামে গেল। রোজ রোজ পাকা তাল পেয়ে বামুন বেজায় আয়েশি হয়ে গেল, সঙ্গে মামদোটাকে দিয়ে তার যাবতীয় ফাই ফরমাস খাটাতে লাগল। এই ভাবে অনেক গুলো দিন কেটে গেল।

একদিন সন্ধ্যায় ব্রহ্মদত্যি তো যথারীতি বেলগাছে বসে গুড়গুড়াচ্ছে আর পাকা তালের জন্যে অপেক্ষা করছে। এমন সময় মামদো এলো মুখ ঝুলিয়ে। সে তাল আনতে পারে নি। তাই কাঁদো কাঁদো মুখে বললে, হুজুর আজ বড় গোল হইয়ে গেলো গো।

হুঁকো থামিয়ে চোখ পাকিয়ে ব্রহ্মদত্যি বলল, আজ এতো দেরি যে বড় ? আমার তাল কোই ?

আজ্ঞে বাবু তাল চেইয়েছিলাম। দেলো নি। বলল হবে নি।

—কী ? বলল হবেনি ? আমার তাল হবেনি বলল ? এতো বড় আস্পর্ধা ? তুই আমার নাম করিস নি ?

—আজ্ঞে বাবু কইরেছি তো।

— তাও দেবে না বলল ? কে সে ? কোন গাছ ?

— আজ্ঞে বাবু তাল গাছ।

ব্রহ্মদত্যি তো রেগে কাঁই। মামদোকে এই মারে কী সেই মারে।

— (মুখ বেঁকিয়ে নকল করে) আজ্ঞে বাবু তালগাছ। মাথা মোটা কোথাকার। তালগাছে তাল পাবিনা তো কী বেলগাছে পাবি ? আমি জানতে চাইছি কোন গ্রামের তালগাছ ? আমাকে শগগিরই নিয়ে চ সেখানে। রোজ একটা করে তাল না খেলে আমার রাতে ঘুম হয় না।

মামদো ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বামুনকে নিয়ে উড়ে চললো সেই তাল গাছের দিকে। সেই তাল গাছে বাস করতো একটা মেছো ভূত আর একটা স্কন্ধকাটা। আর তার পাশেই একটা মস্ত বড় কাঁঠাল গাছের কোটরে থাকতো এক বয়স্ক বামুন পেত্নী আর একটা ছুঁড়ি শাঁকচুন্নি। ভূতগুলোর গুণ্ডারাজে গ্রামের মানুষ ভয়ে ওধার মাড়াত না। বিশেষত বিকেলের পর তো কেউ ভুলেও ওই রাস্তা দিয়ে যেত না। আর কেউ যদি পথ ভুলে সেই গাছের নীচে মাছ নিয়ে গেছে কী তার আর রক্ষে ছিল না। মেছোটা পটাপট ঘাড় মটকে দিত আর মাছ খেয়ে নিত। তবে বামুন পেত্নীকে তারা বেজায় ভয় পেত। বামুন গিন্নী বলে কথা। একবার শুধু সামনে এসে চোখ পাকিয়ে দাঁড়ালেই দুষ্টু ভূতগুলো সব বাধ্য ছেলের মতো সুড়সুড়িয়ে নিজ নিজ ঘরে। এমন সব অনেক কাণ্ড ঘটতো সেই ভূত পরিবারে, সে অন্য গল্প।

এবার আসি বামুন আর মামদোর কথায়। তারা তো সেই তাল গাছটার নীচে এসে দাঁড়িয়ে আছে।

মামদো বললে, হুজুর এই সেই গাছ। এইকেনেই মেছোটা

আমাকে তাইড়িয়ে দেছেলো। আজ্ঞে কত কইরে বললাম আমার বাবুর একটা পাকা তাল না হলে চইলবেনাকো তা কি চুতেই শুনল না গো।

— বটে। তা দেখি সেটাকে একবার। বেম্মদত্যির সঙ্গে মামদোবাজি হ্যাঁ ?

শাঁকচুন্নিটা তখন সবে মাত্র গরু চরানোর মাঠ থেকে একটা কচি ছাগল বগলদাবা করে নিয়ে বাসায় ফিরছিল সবাই মিলে আয়েস করে খাবে তাই। ফিরে এসে তার বাড়ির সামনে নতুন লোক দেখে ভাবল বুঝি তাদের বাসার ভাগ বসাতে এসেছে। ওমনি হাঁউ মাঁউ করে তেড়ো গেলো। তারপর যেই না ব্রহ্মদত্যিকে দেখতে পেলো ওমনি ভয়ে কাঁঠাল হয়ে গেলো আর ঝুপ করে মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি খেতে থাকলো। শাঁকচুন্নির চিৎকার শুনে মেছো আর স্কন্ধকাটা লাফিয়ে পড়ল তাকে বাঁচাবে বলে। মামদোকে দেখেই তো বেজায় চটে গেল। ভাবল নিশ্চয়ই এই ব্যাটাই শাঁকচুন্নিকে মারছে। ওমনি দেখল বেঁটে বামুন গনগনে লাল ভাটার মতো চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। ব্যাস আর যায় কোথা ? ভয়ের চোটে দুজনেই দুটো তাল হয়ে গেল। মামদো খুশিতে হাততালি দিয়ে বললে, খুব হয়েচে। বেশ হয়েচে। দ্যাক কেমন লাগে একন। কেমন জব্দ।

ঠিক সেই সময় হৈ চৈ শুনে বাসা থেকে উঁকি মারল পেত্নী। জাঁদরেল গলা ছেড়ে বলল, কে র‍্যা ? আমার বাসায় এসে চিল্লাচিল্লি করচিস ?

তারপর নীচে উড়ে এসে মেছো, স্কন্ধ আর শাঁকচুন্নির ওই হাল দেখে অস্থির হয়ে বলল, এ কী, আমার বাছাদের এমন দশা কে করলে গো-ও-ও-ও। কে আছিস দেখি একবার, মুণ্ডু খুলে নেবো তার।

পেত্নী রেগে গর্জন করে উঠলো। যেন প্রচণ্ড শব্দে কোথাও বাজ পড়লো। মাটি থর থর করে কেঁপে উঠলো একবার। পেত্নীর হুঙ্কার শুনে মামদোটা ভয়ে গোল হয়ে লুকিয়ে পড়লো ব্রহ্মদত্যির পেছনে। ওমনি ব্রহ্মদত্যি একটা পাকা বেল হয়ে গেলো। পেত্নী তো এতক্ষণ ব্রহ্মদত্যিকে দেখতেই পায়নি। যেই না দেখলো জিভ কেটে মুখে ঘোমটা টানল।

একি। এ তো তুমি গো। ছিঃ ছিঃ ছিঃ কি নজ্জা।

এই না বলে পেত্নী লজ্জায় রাঙা হয়ে একটা লাল টুকটুকে আপেল হয়ে ব্রহ্মদত্যির পায়ের কাছে গড়াগড়ি খেতে লাগলো। ব্রহ্মদত্যি কাঁচুমাচু মুখ করে বলল,

— গিন্নী তোমায় কতো খুঁজেছি জানো ? এই একশোটা বছর ধরে এ গাছে সে গাছে খুঁজে খুঁজে না পেয়ে শেষে কতো কেঁদেছি। ভেবেছিলাম এ মরনে বোধ হয় আর খুঁজে পাবো না। আরও বার মরলে পরে তোমায় খুঁজে পাবো হয়তো। অবশেষে পেলাম তবে, কি বলো ?

— ও মা। কিযে অলুক্ষুনে কতা বলো তুমি। তোমার কেন মরণ হবে গো। তুমি চলে গেলে পরে আমি যে বাকি বচ্ছর গুনো কীভাবে কাটিয়েচি তা কেবল টুনা-টুনিই জানে গো। রোজ বলতাম সবার মরণ হয় আমি মরিনা ক্যানো। অবশেষে মরণ হল।

এই বলে পেত্নী ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে কান্না জুড়লো। গিন্নীর কান্না দেখে আবেগে বামুনের চোখেও জল এলো। গিন্নীকে সে ডরায় ঠিকই কিন্তু ভালোবাসেও তো। একশো বছর পর পেত্নীর চাঁদ পানা মুখখানি দেখে ব্রহ্মদত্যি গদ গদ হয়ে গেল।

— আহা হা। অমন করে বোলো না গো টুনির মা। মনে বড় ব্যথা পাই যে। আচ্ছা মনে আছে তোমার, তুমি যে রোজ আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে আর বলতে যে বাপের বাড়ি চলে যাবে আর জন্মে আমার মুখ দেখবে না। তা সেই মুখ দেখতেই হল কি বলো ?

পেত্নী কেবল ঘোমটা টেনে মুচকি হেসে বললে, আঃ মরণ।

একশো বছর পর বামুন তার গিন্নীকে ফিরে পেলো। আর সঙ্গে জুটে গেল ক'টা ছানা ভূত। শাঁকচুন্নি, স্কন্ধ আর মেছো খুব ভালো ছেলে-মেয়ে হয়ে গেল। আর তারা কারও কে জ্বালাতন করতো না। তারপর ছানা ভূতে আর পোনা ভূতে মিলে আনন্দে মিলেমিশে থাকতে লাগল।

## বাদশাহি রান্না

### স্মৃতিকণা মুখোপাধ্যায়

সব্বাই বলে নাকি খাসা মোর রান্নার বাঁধুনি,
মশলার পাট থেকে বাদ রাখি নুন আর রাঁধুনি।
তেলে চুনে কষে নিয়ে মাংসেতে পাঁচফোড়ন
এই বেলা শুনে নাও মশলার ব্যাকরণ।
কাজ নেই ফর্দে কাজ নেই কাগজে,
কানটাকে খোলা রেখো গুঁজে রাখো মগজে।
ঝোলে-ঝালে ভালো হয় ধোঁকা আর ডালনা
স্বাদটাও বেড়ে যাবে গুলে দিলে তিনফোঁটা কান্না।
জিরে-ধনে-আদা বাটা কালিয়াতে সকলেই দিচ্ছে
আমি শুধু দিই তাতে গোটা ছয় উচ্ছে।
রাঁধি যদি পুঁইডাটা মুলো, লাউ-চিংড়ি
গলাটাও সেধে রাখি গেয়ে চলি খেয়াল বা ঠুংরি।
কই আর ইলিশের পাতুরিতে হয়ে যাই জব্দ,
পাড়া আর প্রতিবেশি শুনে শুধু ছ্যাং ছ্যাং শব্দ।
খাসা আমি রাঁধি ভাই কখনো তো হয়না তা মন্দ
গান গেয়ে রেঁধে চলি মনে মনে নৃত্যের ছন্দ।

# ছবি তৈরির অজানা গল্প

## প্রণব হোড়

অনেক বছর আগে। সবে কলেজ পেরিয়েছি। একটু একটু আঁকাআঁকি করি। সেই সূত্রে পরিচয় চিত্র পরিচালক নব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের সাথে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনি নিয়ে তিনি তখন ছবি করতে চলেছেন "পরশুরামের কুঠার"। শুটিং পটভূমিকা ওড়িশার কেওনঝড় অঞ্চল। আমাকে পরিচালক বলেছিলেন, "আমি তোমার মতন ছেলে চাইছি আমার সহকারী হিসেবে।"

আমি তাতেই উৎসাহে লাফিয়ে পড়ি। ফিল্মের অ-আ কিছুই তখন জানা নেই। ভাবলাম এই সুযোগে রথ দেখা কলা বেচা দুটোই হয়ে যাবে কিছুটা।

দীর্ঘ একমাস ধরে শুটিং পর্ব চলবে। ওই একই অঞ্চলে। সময়টা শীতের শেষদিক। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি, নব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায় এই ছবি করার আগে আরো দুইবার জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন। শট নেওয়ার সময় প্রত্যেক ব্যাপারে খুঁটিনাটি দেখে নিতেন। কাহিনির প্রয়োজনে যাবতীয় শর্ত মনে চলতেন। লাইট, সেট, অভিনয় কোথাও কোন ত্রুটি রাখা চলতো না। আমার দায়িত্ব ছিল মূলতঃ সেট পর্যবেক্ষণের উপর। আবীর, মুন্সী ছিলেন শিল্প নির্দেশক।

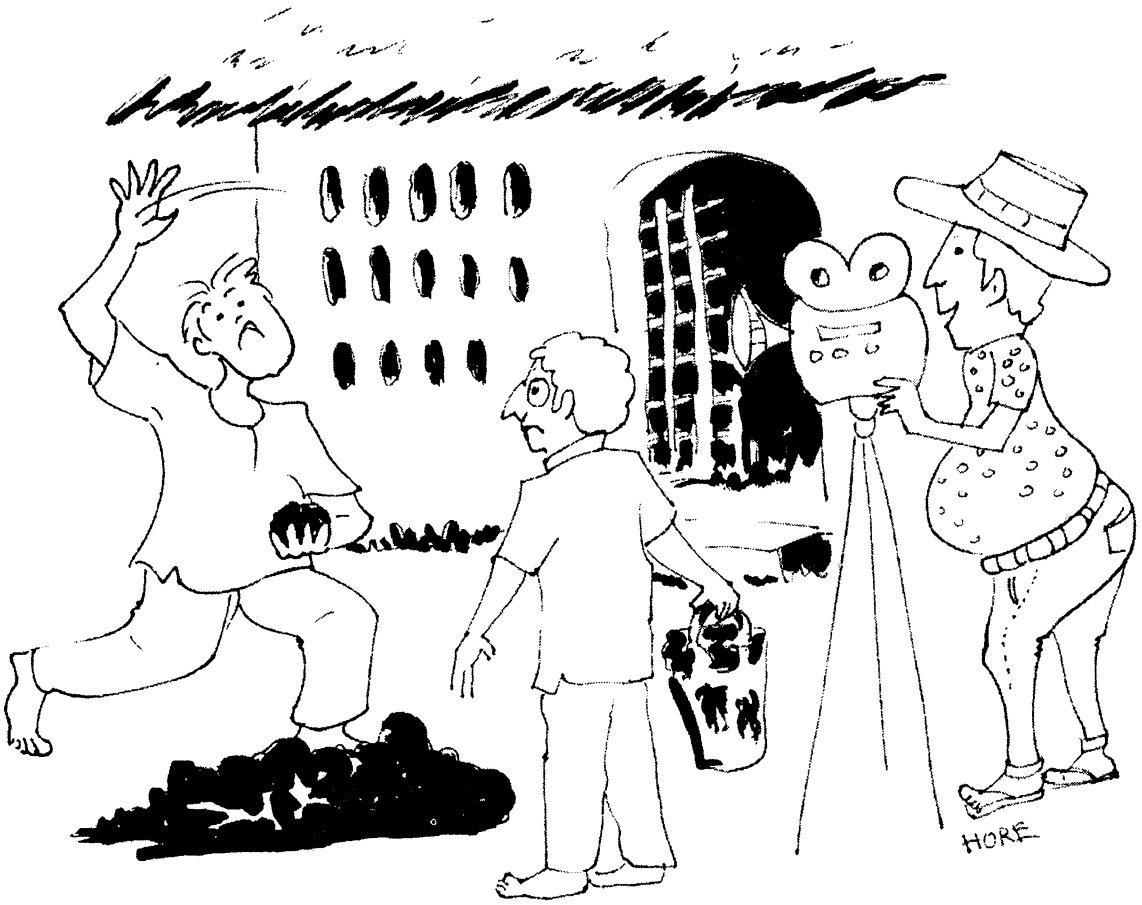

কিন্তু সমস্যা হল এই ছবি ষ্টুডিওর ভিতরে নয়। সেখানে প্লাইউড, তক্তা, চট এসব দিয়ে অনবদ্য সব সেট বানানো যায়। আমাদের এই ছবির সম্পূর্ণ লোকেশন উন্মুক্ত আকাশের নীচে। কৃত্রিম সেট আমাদের পরিচালকেরও পছন্দ নয়।

কাহিনিটি ছিল লক্ষ্মী নামে এক মহিলাকে কেন্দ্র করে ( নাম ভূমিকায় ছিলেন নবাগতা শ্রী লেখা মুখোপাধ্যায় এবং চরিত্রাভিনেত্রী হিসেবে ১৯৯০ সালে তিনিও শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর জাতীয় পুরস্কার পান)। লক্ষ্মী যে কুঁড়ে ঘরে থাকতো সেই ঘরটিকে সময়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কুড়ি বছর আগে পরে দেখানো হবে ছবিটিতে।

রবি দাস নামে গ্রামের এক দরিদ্র লোকের কুঁড়ে ঘরটিকে সেট নির্বাচন করা হয়েছিল। মজার কথা হচ্ছে, শুটিং শুরুর এক মাস আগে যখন সেই বাড়িটিকে নির্বাচন করা হয়েছিল তখন সত্যি জরাজীর্ন ছিল বাড়িটি। একমাস পর শুটিং করতে গিয়ে দেখি তিনি বাড়ির ফাটল ধরা মাটির দেওয়ালে নতুন মাটির পোঁচ দিয়েছেন। পুরনো কালো হয়ে যাওয়া খড়ের চাল নতুন করে খড় বিছিয়েছেন। আগে ঠিক ছিল কুড়ি বছর পরের শট্ টেক করা হবে রবি দাসের জরাজীর্ণ বাড়িটিতে তারপর দু-তিনদিনে স্থানীয় ঘরামী লাগিয়ে বাড়িটি তুলনামূলক ভাবে নতুন করে সাজিয়ে কুড়ি বছর আগের শট টেক করা হবে।

কিন্তু এতো শুরুতেই নতুন বাড়ি হয়ে রয়েছে। পরিচালক বললেন, "আমরা তবে কুড়ি বছর আগের শট আগে টেক করবো, বাড়িটি তখন নতুন থাকার কথা। শুধু দেওয়ালগুলো বড্ড ঝকঝক্ করছে। এগুলো পুরনো করে দাও।

লক্ষ্মী বাড়ির বারান্দায় মাটির উনোনে কাঠ জ্বালিয়ে রান্না করতো। দেওয়ালে তাই কাঠকয়লার ধোঁয়ার চিহ্ন থাকার কথা। কয়েকটা ছোট কেরোসিন লম্ফ জোগাড় করে জ্বালিয়ে দেওয়ালে কালো কালো ছোপ করা হল। বাড়ির বাইরের দেওয়ালে লক্ষ্মীর ঘুঁটে দেওয়ার কথা। আগে থাকতেই কয়েকটা ঘুঁটে শুকোচ্ছে এমনটা করতে হবে। গোবর জোগাড় করা হল। স্থানীয় এক মহিলাকে বলা হল দেওয়ালে ঘুঁটে দেওয়ার জন্য। তিনি দিলেন কিন্তু কেমন যেন সব গোল গোল গোছের। কাহিনি এই বাংলার। গ্রাম্য বাংলার ঘুঁটে দেওয়ার নিয়ম হল গোল চাকা চাকা ঘুঁটের মধ্যে চার আঙুলের ছাপ থাকবে। ওড়িশ্যা অঞ্চলের মানুষেরা ঐভাবে দিতে জানেন না। আর আমরাও পটু নই। পটুয়া বলে সব ব্যাপারে পটু হতে হবে এমনটাও নয়। একটু রাগই হচ্ছিল আমার।

হাল ধরলেন অশোক বসু। আমাদের অন্য এক সহকারী। ছোটবেলায় গ্রামবাংলায় কাটিয়েছেন। আমাদের উদ্দীপত করে বললেন, "এইভাবে ঘুঁটে দিতে হয়। আমার কাছে শেখো।"

ভাগ্যি তার অভিজ্ঞতা ছিল। পরিচালক মহাশয়ও খুশি হলেন।

শুটিং চলল দিন পনেরো। তারপর আবার দৃশ্য বদল হওয়ার কথা। নতুন খড়ের চালের পুরনো খড় চাই। এবার আমরা বেরোলাম পুরনো খড় খুঁজতে। সেই তল্লাটে কোথাও পেলাম না তেমন খড়। কে একজন খবর দিল পাশের গ্রামে একটা বহু পুরনো খড়ের চাল রয়েছে। এবার স্বয়ং পরিচালকের সাথে গাড়ি করে আমরা সেই খড় দেখতে গেলাম। পরিচালকের পছন্দ হল। বলা হল, আমরা ঐ বাড়িতে নতুন খড়ের চাল বিছিয়ে দেব। বিনিময়ে ঐ ছাদ তুলে নিয়ে রবি দাসের খড়ের চালে বিছিয়ে দেওয়া হবে।

সেই বাড়ির গৃহকর্তা রাজি হলেন না। তিনি বুঝে গিয়েছেন এরা ফিল্মের লোক। মোটা টাকা চাইতে হবে। বললেন, শুধু এ বাড়ির খড়ের চাল বদলালে হবে ? পুরো বাড়িটাই নতুন করে ছাইতে হবে সেই পয়সাও চাই।

তাই দিতে হয়েছিল।

বিনিময়ে সেই জরাজীর্ণ অতি দীর্ণ খড়ের চাল খুলে নেওয়ার অনুমতি পেয়েছিলাম। এত বছর পরেও কিন্তু সেই লোকটির বুদ্ধির তারিফ করতে হয়। একেই বলে - ঝোপ বুঝে কোপ মারা।

---

## টানা গন্ডির মাঝখানে

### বিকাশচন্দ্র দাস

পাশের বাড়ির ছোট্ট মেয়েটা এনেছিল রং-তুলি,
বলেছিল কাকু, এঁকে দাও তুমি ছোটো এক বুলবুলি।
সবুজ পাতারা বাতাসে দুলুক, পাখিটা বসুক ডালে,
সুরে মাখামাখি হোক চারদিক গানে গানে তালে তালে।

আরো বলেছিল, পারো যদি দাও গাঁয়ের ছবিটা এঁকে,
বাঁদিকে ধুলোর রাস্তার পাশে নদী গেছে এঁকেবেঁকে।
মায়ের সঙ্গে হাঁটা পাশাপাশি, আকাশটা হাসে নীল,
দুঃখের পাশে মোটা দাগ টেনে সুখ দিয়ে জুড়ি মিল।

গাছপালা নদী ধুলোর রাস্তা পাখিটার কোলাহল
সব ঠিক ঠিক, তবু শেষে দেখি মেয়েটার চোখে জল।
বলে কাকু, তুমি মেলাতে পারোনি পালটে গিয়েছে সব—
টানা গন্ডির মাঝখানে কাঁদে আমাদের শৈশব।

ছোটদের নাটক

## চরিত্র

বিষ্ণু
দেবরাজ ইন্দ্র
বরুণদেব
যমরাজ
চিত্রগুপ্ত
নারদ
অন্যান্য দেবগণ

স্বর্গপুরি। বিষ্ণু স্বয়ং বসে আছেন অনন্ত সিংহাসনে। তাঁর চারিপাশে মুগ্ধ শ্রোতার ভূমিকায় বিভিন্ন দেবগণ। রয়েছেন বরুণ দেবতা, রয়েছেন যমরাজ, তাঁর সহকারী চিত্রগুপ্ত এবং আরও বহু দেবগণ। চলছে কিছু আলাপ আলোচনা....

**বিষ্ণু :** তা যে কথা বলছিলাম দেবগণ...আমাদের এই স্বর্গরাজ্য অনন্ত সৌন্দর্যের আধার। কী নেই এখানে ! যেমন সুন্দর প্রকৃতি, মুক্ত বাতাস, তোমাদের মত পরম পূজনীয় দেবগণ.. সবই অতি চমৎকার..(অন্যদের মুখের দিকে তাকিয়ে) কী বলো তোমরা ?

**দেবতারা :** (সমস্বরে) নিশ্চয় ! প্রভু নিশ্চয় !

**ইন্দ্র:** তাছাড়া প্রভু আপনি যেখানে মাথার উপর আছেন বিধানদাতা হয়ে, আছেন প্রজপতি ব্রহ্মা, আছেন স্বয়ং মহাদেব.. সেখানে আর ভাবনা কী !

**বিষ্ণু :** সেকথা ঠিকই দেবরাজ, তবে কিনা...(এমন সময় বাইরে থেকে নারদের গলার আর্ত চিৎকার ভেসে এল) বাঁচান... প্রভো... বাঁচান.. প্রভো.. বাঁচান আমাকে..(সকল দেবতা চমকিত হন)

**বিষ্ণু :** একি ! দেবর্ষি নারদের গলা মনে হচ্ছে !

**চিত্রগুপ্ত:** হ্যাঁ প্রভু... এডা তো নারদের গলাই লাগতাছে ! নারদের আবার হইল কী ! পেটের ব্যথায় চিৎকার করত্যাসে নাকি !

**বিষ্ণু:** উফ ! চিত্রগুপ্ত ! চুপ করো !... চুপ করো তুমি... তোমার এই বাঙাল ভাষায় কথা বলা বড়ই শ্রুতিকটু ! এখন দেখতে দাও নারদের কী হল ! যমরাজ

**যমরাজ:** (এতক্ষণ ঝিমাচ্ছিলেন চেয়ারে ! চমকে ওঠার ভঙ্গিতে) ইয়েস স্যার ! থুড়ি..প্রভু.

**বিষ্ণু:** (বিরক্ত মুখে) আরে দ্যাখো.. দ্যাখো শিগগির নারদের কী হল, এমন উন্মত্ত হয়ে চিৎকার-ই বা করছে কেন নিশ্চয় কোনও বিপদে পড়েছে।

# স্বর্গে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

## শুভজিৎ বরকন্দাজ

**চিত্রগুপ্ত:** কি কইত্যাছেন প্রভু ! এই স্বর্গ রাজ্যে বিপদ ? এ যে ভাবন যায় না ।

**বিষ্ণু:** আহ ! তোমরা দেখি বড্ড বেশি লুজ টক করো ! যাও দ্যাখো গিয়ে চিত্রগুপ্ত...দ্যাখো নারদের কী হল ?

**চিত্রগুপ্ত:** (বিরক্তমুখে) যাইতাছি ছ্যার... তবে আমি এই কইয়া দিলাম আপনারে, নারদের হইল গিয়া কইমাছের পরান! কিছুই হইব না ওর। বিপদ নারদরে কী করব। নারদ-ই তো হইল গিয়া আস্ত বিপদ ! বিপদরে পাকড়াও কইর‍্যা বিপদে ফেইলতে নারদের জুড়ি নাই !

**বিষ্ণু:** (ধমক দিয়ে) আহ ! চিত্রগুপ্ত ! বড্ড বাজে বকছ দেখছি ! এসব তোমার মুখে শোভা পায় না। যাও দ্যাখো গিয়ে শিগগির।

**চিত্রগুপ্ত:** যাইতাছি.. ছ্যার.. যাইতাসি... (এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে নারদের প্রবেশ)

**নারদ:** (ধমক দিয়ে) প্রভো ! বাঁচান প্রভো. বাঁচান আমাকে... প্রভো গো... প্রভো কী প্রবলেমে যে ফেঁসে গেলাম প্রভো।

**চিত্রগুপ্ত:** আরে, নারদ দেখি হাঁপাইতাসে...! আরে কোই হ্যায়... ওর লগে এক গিলাস জল আনিয়ে... পানি পানি.. ওয়াটার .. কোই হ্যায়.. (স্বগোতোক্তি) কে জানে সত্যিকারের হাঁপাইতাসে নাকি ঢং করতাসে...

**নারদ:** আহ ! থাম চিত্রগুপ্ত ! তোমার এই ভড়ং দেখলে গা জ্বলে যায় ! (আবার হাঁপানি)।

**বিষ্ণু:** শান্ত হও দেবর্ষি নারদ ! উত্তেজনা প্রশমিত করো।

**নারদ:** নারায়ণ ! নারায়ণ !

**চিত্রগুপ্ত:** (স্বগোতোক্তি) এই তো পথে আইছে ! যা ভাবতেছিলাম.. পুরোটাই ঢং ! ঢপের চপ ভাজতেছিল ব্যাটা !

**নারদ:** (চিত্রগুপ্তের দিকে তাকিয়ে) তখন থেকেই দেখি বিড়বিড় করছ চিত্রগুপ্ত ! বলি মতলব টা কী তোমার ! আমারে দেখি তোমার এক মুহূর্তের তরে সহ্য হয় না !

**চিত্রগুপ্ত:** (তেড়ে উঠে) চুপ কইর‍্যা থাহেন ! আমি রাইগ্যা গ্যালে মুখে আপনার সেলোটেপ ঘইস্যা দিমু !

**নারদ:** (রাগে) ঈঃ ... মামদোবাজি !

**বিষ্ণু:** (প্রচন্ড বিরক্ত হয়ে) আহ ! কী ছেলেমানুষি শুরু করেছ দু'জনে ! থামো ! থামো বলছি !

**নারদ:** নারায়ণ ! নারায়ণ!

**চিত্রগুপ্ত:** (ঢোঁক গিলে আমতা আমতা করে) প্রভু.. ইয়ে মানে ছ্যার !

**বিষ্ণু:** আজকাল মাঝে মাঝেই তোমরা দেখছি সহ্যের সীমা অতিক্রম করে চলেছো। দিন দিন তোমাদের দেখছি টলারেট করাই মুসকিল হয়ে যাচ্ছে। যতই হোক বয়স হয়েছে তোমাদের। এইসব ছেলেমানুষি করা তোমাদের সাজে না... ( কথা থামিয়ে) তা নারদ... তুমি মনে হয় কোনও সমস্যায় পড়েছিলে। তোমার চিৎকার শুনে আমরা বড়ই বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম !

**চিত্রগুপ্ত:** চিৎকার মানে চিৎকার ! সে যে ষণ্ডের মত চিৎকার !

**নারদ:** (চিত্রগুপ্তের দিকে কটাক্ষ করে) নারায়ণ ! নারায়ণ !.. প্রভো.. সে খবর সাংঘাতিক !

**বিষ্ণু:** (চমকে) বলো কী দেবর্ষি !

**দেবতারা:** (একযোগে) অ্যাঁ, হল কী দেবর্ষি নারদ !

**চিত্রগুপ্ত:** (স্বগোতোক্তি) এইবার ব্যাটা নির্ঘাত একখানা গুছিয়ে গুল ঝাড়বে!

**নারদ:** (সকলের দিকে করজোড়ে প্রণাম করে) প্রভো.. (আবার হাঁপানি), পো পো প্রভো.. প্রভো গো...

**বরুণ:** আহ্ নারদ! তুমি দেখছি, বেশ তোতলা হয়ে উঠছ দিন দিন ! প্রভু শুনতে চাচ্ছেন। আমরাও টেনশন নিয়ে অপেক্ষা করছি। বলো শিগগির !

**চিত্রগুপ্ত:** হ্যাঁ, কইয়া দ্যাও.. কইয়া দ্যাও.. শিগগির... (দর্শকদের দিকে মুখ করে) সক্কলে মিলে খাইব..ঢপের চপ।

**নারদ:** (সকেলর মুখের দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে টেনশনগ্রস্থ মুখে) প্রভো... আপনি তো আমাকে মর্ত্যে পাঠিয়েছিলেন, লেটেস্ট মডেলের মোবাইল ফোনের তত্ত্ব-তালাশের ফরমাস দিয়ে... কিন্তু...

**বিষ্ণু:** (নারদের মুখের কথা কেড়ে) আহ্ ! সেসব অপ্রাসঙ্গিক বিষয় দেবর্ষি ! সেসব বিশদে পরে সবার সাথে আলোচনা করা যাবেখন! তুমি তোমার বিপদের কথাই বলো এখন !

**চিত্রগুপ্ত:** এই খাইচে... ছ্যারও দেখি এখন ট্যাকনোলজির ভক্তি হইয়া পড়তাছেন। কী দিনকাল আইল গিয়া !

**বিষ্ণু:** আহ্ ! চিত্রগুপ্ত ! বড্ড বাজে বকছ তুমি ! (অন্য দেবতাদের দিকে তাকিয়ে) দেবগণ, আপনারা আমায় ভুল বুঝবেন না। আমি নারদকে মর্ত্যে পাঠিয়েছিলাম একটা জরুরী বিষয়ের খোঁজখবর নিতে। তবে জানবেন সেটা আপনাদের সুবিধার জন্যেই। ( দেবতারা নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া চাওয়ি করেন)।

**দেবগণ:** (একসাথে)আমাদের সুবিধা ? ইয়ে... মানে ... ঠিক...

**বিষ্ণু:** সে অতি চমৎকার বিষয় দেবগণ। শুনেছি মর্ত্যে ইদানিং টেকনোলজির দারুণ ব্যবহার শুরু হয়েছে। কমপিউটার, মোবাইল ফোন.. ইত্যাদির রমরমা বাজার চলছে সেখানে। বহু কিছুই নাকি অতি দ্রুত করা সম্ভব হচ্ছে বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে । তাই আমি নারদকে পাঠিয়েছিলাম, টুকটাক ইনফর্মেশন নিতে। যাতে আগামীতে এগুলির ব্যবহার করে আপনারা স্বর্গে একটা বিপ্লব এনে দিতে পারেন !

**চিত্রগুপ্ত:** ( ঢোঁক গিলে স্বগোতোক্তি) ছ্যারও দেখি আজকাল গুছিয়ে গুল মারতাসেন !

**বিষ্ণু:** তা দেবর্ষি নারদ ! শুনাও তোমার বিপদের কথা ! আর লেট কোরো না !

**নারদ :** নারায়ণ ! নারায়ণ ! প্রভো, বিপদ এখন শিয়রে ! আর সে বিপদ কী আমার একার ! বিপদ এখন আমার, আপনার ।

**দেবগণ:** (সমস্বরে) অ্যাঁ আ আ আ .. সবার বিপদ ? বল কী নারদ ?

**নারদ:** তবে আর বলছি কী !

**চিত্রগুপ্ত:** (স্বগোতোক্তি) এইবার ভাও খাইব !

**নারদ:** (বিষ্ণুর দিকে তাকিয়ে) কবে থেকেই আপনার কাছে অ্যাপ্লাই করে রেখেছি প্রভো, স্বর্গে একটা হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা করেন। তা আপনি তো আমার কথা কানেই তোলেন না প্রভো ! বারবারই সেই এক কথা শোনান, সরকারী কোষাগারে অর্থসংকট ! একটিবার বিবেচনা করে দ্যাখেন প্রভো ! এই মান্ধাতা আমলের ঢেঁকি চড়ে একে প্রেসটিজ পাংচার ! তায় আবার মাইলেজও দেয় না। মেরে কেটে ধরুন ঘন্টায় পাঁচ কিলোমিটার। বলুন প্রভো, এই আধুনিক যুগে এসে সেটা কি পাতে দেওয়ার মতো ? আজ তো আমার পৈতৃক জানটাও খোয়াতে বসেছিলাম এই ঢেঁকির চক্করে পড়ে ! প্রভো ডিউটি করতে গিয়ে জান খোয়ানো। আমার বুঝি রেজিগনেশন দেওয়া ছাড়া আর কোনও গতি থাকলো না প্রভো !

**চিত্রগুপ্ত:** তখনই কইয়া দিছি, টোটাল ধান্দাবাজ !

**বিষ্ণু:** আঃ নারদ ! সে হবেখন ! আগামী মিটিংয়ে আমরা তোমার ব্যাপারটা মাথায় রাখবখন। আমি দেবরাজ ইন্দ্রকে অনুরোধ করছি এই ব্যাপারে অ্যাজেন্ডা করে আগামী মিটিংয়ে পেশ করতে। এখন তুমি আর দেরি কোরো না ! তোমার বিপদের কথাটাই বলো দেখি। সকল দেবগণ কখন থেকেই টেনশন নিয়ে অপেক্ষা করে আছেন এদিকে !

**যমরাজ:** আমি তো আবার হার্টের পেজেন্ট !

**দেবগণ:** (সমস্বরে) হ্যাঁ দেবর্ষি বলুন তো ! সেটাই বলুন ! আপনার বিপদটা কী ?

**নারদ:** আর বলবেন না দেবগণ... মর্ত্যে এখন হচ্ছে পাখির ফ্লু...

**দেবগণ:** অ্যাঁ... ফ্লু ?

**যমরাজ:** ফুলু ? সেটা আবার কী হে নারদ ? খায় না মাথাতে দেয় ?

**নারদ:** ফ্লু ... ফ্লু.... মারণ রোগ বোঝেন না ?

**যমরাজ:** (করুণ গলায়) না হে নারদ ! রবিন বুলুর নাম শুনেছি ! কিন্তু ফুলুর নাম তো বাপের জন্মে শুনি নাই ! কী জ্বালা বল দেখি।

**চিত্রগুপ্ত:** (স্বগোতোক্তি) শোনবেন কী কইর‍্যা, পড়া-লেখাডা তো আর বেশিদূর করেন নাই ! চাকরি জুটাইয়াছিলেন বাপ দাদাগো সুপারিশে ! এখন বোঝস্ ঠ্যালা।

**নারদ:** (যমরাজের দিকে তাকিয়ে) নাকে কাঁদবেন না যমরাজ ! মানুষ মারাই তো আপনার কাজ ! মানুষ শুধু মারেন ! কার ধার-ই বা ধারেন !

**যমরাজ:** (রেগে উঠে) দেবর্ষি নারদ ! ছোটমুখে বড় কথা বোলো না হে ! মানুষ মারি সাধে ! বলতে তোমায় বাধে !

**নারদ :** (ফুঁসে উঠে) ইঃ ইঃ ইঃ...

**চিত্রগুপ্ত:** (নারদের দিকে তেড়ে গিয়ে) ইঃ ইঃ ইঃ ! চোক রাঙ্গাইবেন না... চোক রাঙ্গাইবেন না ! যমরাজ হইলেন গিয়া আমার হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট ! তার বেইজ্জতি হইলে আমি কিচ্ছুতেই মানুম না ! জান দিয়া দিমু...

**যমরাজ:** (নারদের দিকে তাকিয়ে) আয়ুর হিসেব আমার চেয়ে বেশি কি তুমি বোঝো ? কাজ তো তোমার লাগান-ভাঙান্ পরের ত্রুটি খোঁজো ! (বিষ্ণুর দিকে তাকিয়ে) প্রভো ঃ আর পারছি না প্রভো ! এ অপমান আর সইতে পারছি নে... আজই আমি রেজিগনেশন দেব, আজই... চিত্রগুপ্ত ? (যমরাজের চোখে জল)

**চিত্রগুপ্ত:** ইয়েস ছ্যার...

**বিষ্ণু:** (প্রচন্ড রেগে উঠে দাঁড়িয়ে) থামো ! খাজনার চেয়ে বাজনা বাড়াস... এটাই তোদের ব্যামো ! খুব হয়েছে খুব ! এবার সবাই চুপ... (সভা জুড়ে নিরবতা) নারদ তুমি বল.. কিসেতে কী হল ! (সভা জুড়ে নিরবতা, সকলের মাথা নীচু.. নারদ বলতে শুরু করেন)

**নারদ:** প্রভো ! খবর খুবই সাংঘাতিক ! মর্ত্যে এখন বার্ড-ফ্লু রোগের প্রকোপ বেড়েছে প্রভো ! নির্বিবাদে মরছে সেখানে পাখিরা। চিকেন মর্ত্যে অমৃতের সমান প্রভো... মর্ত্যের মানুষ চিকেন দিয়ে রোল বানাতো চিকেন দিয়ে চপ.. চিকেন দেওয়া বিরিয়ানি গিলতো গপাগপ..

**চিত্রগুপ্ত:** ( ঢোঁক গিলে) আহা ! স্বর্গে চিকেন অ্যালাউ হত, বাহা !

**যমরাজ:** (চোখের জল মুছে, জিভ চেটে) চিকেন বিরিয়ানি ! সুমধুর জিনিস !

**বিষ্ণু:** বল কী নারদ !

**দেবগণ:** কী সাংঘাতিক !

**নারদ:** মর্ত্যে এখন চিকেনের গল্প শেষ প্রভো ! পাখির গায়ে জাঁকিয়ে রোগ ধরেছে। পাখিরা এখন পট পট করে মরে যাচ্ছে

**বিষ্ণু:** বলো কী নারদ ! কী শোনালে এ ! আমরাও যে স্বর্গপুরে বহু পাখি পালন করি!

**যমরাজ:** মরবে নাকি তারা ? যায় না দেখি পারা !

**নারদ:** ছোঁয়াচ প্রভো ছোঁয়াচ এ রোগ মরছে নাকি জীব ও... স্বর্গে যদি ও রোগ ধরে বাদ যাবে না শিবও (আকাশের দিকে প্রণামের ভঙ্গিতে)।

**চিত্রগুপ্ত:** খাইছে !

**দেবগণ:** কী সাংঘাতিক ! কী সাংঘাতিক ! প্রভো কী হবে উপায় !

**নারদ:** সেই কথাই তো বলছিলাম দেবগণ... কোনও রকমে প্রাণটা হাতে নিয়ে পালাতে পেরেছি অবশেষে ! হেলিক্যাপ্টারের অ্যাপ্লাইটা কী আর এমনি এমনি করেছিলাম বলুন ?

**চিত্রগুপ্ত:** (স্বগোতোক্তি) আবার ধান্দাবাজি !

**দেবগণ:** (ভয়কাতর গলায়) প্রভো ! সর্বনাশ হয়ে যাবে প্রভো ! রক্ষা করুণ আমাদের।

**বিষ্ণু:** আহ ! থাম সকলে ! আমাকে একটু ভাবতে দাও ব্যাপারটা। (বিষ্ণু উঠে পায়চারি করেন... সকলে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে নীরব হয়ে অপেক্ষা করেন... একটু পর উল্লসিত গলায় বিষ্ণু বলেন ) তবে শোনো... এ নিয়ে আমাদের খুব একটা চিন্তার কারণ দেখি না ! উপায় একটা পেয়েছি বুঝলে !

**দেবগণ:** অ্যাঁ, উপায় !

**বিষ্ণু:** হ্যাঁ ধৈয্য ধরো সকলে। সমস্যা যেমন রয়েছে সমাধানও রয়েছে সেখানেই। ব্যাপারটা কিছুটা মাছের তেলে মাছ ভাজার মতই।

**চিত্রগুপ্ত:** কী কইর‍্যা ভাজুম ছ্যার... স্বর্গে তো মাছ-ই অ্যালাউ নাই... কতদিন ধইর‍্যা আমার চিংড়ি মাছের মালাইকারি খাওনের সখ, তা ছাতার স্বর্গের নিয়ম-নীতির গেরোয় পইড়্যা পরানডা আমার কয়লা হইয়া গেল ছ্যার !

**বিষ্ণু:** আহ ! চিত্রগুপ্ত ! তুমি দেখি বাহাত্তুরে বুড়ো হয়ে গেছ একেবারে ! শোনো আগে আমার কথা ! মাছের তেলে মাছ ভাজার অর্থ সত্যিকারের মৎস নয়, এর অর্থ কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা !

**নারদ:** নারায়ণ ! নারায়ণ ! প্রভোর লীলা বোঝা দায় !

**সকলে:** সেটা কীরকম প্রভো !

**বিষ্ণু:** (মুচকি হেসে) তবে আর বলছি কেন । শোনো সকলে, মর্ত্যে বহু জ্ঞানী-গুণী পন্ডিত মানুষের বাস। বহু বিজ্ঞানী সেখানে দিনরাত পরিশ্রম করে চলেছেন তাদের সাধনায়। তোমাদের মতো অলস জীবন যাপনে তারা অভ্যস্ত নয়। (সকলের মুখ ব্যাজার হয় এ কথা শুনে) কিছু না কিছু একটা উপায় তো তারা বের করবেনই।

**চিত্রগুপ্ত:** করবেন যে কইলেন ছ্যার.. তার গ্যারান্টি কী ?

**বিষ্ণু:** ওহঃ চিত্রগুপ্ত তুমি দিন দিন বেশ বাচাল হয়ে উঠছ দেখছি ! এটা অবশ্য তোমার দোষ নয় ! দোষ তোমার বয়সের। যাই হোক যে কথা বলছিলাম, শোনো দেবগণ... উপায় একটা হবেই... এ আশ্বাস আমি তোমাদের দিচ্ছি ! তবে

তোমাদেরও কিন্তু কিছু দায়িত্ব আছে সেকথা ভুলে গেলে চলবে না !

**দেবগণ:** দায়িত্ব ? কী দায়িত্ব প্রভো ?

**বিষ্ণু:** আর কতদিন ? আর কতদিন এভাবে তোমরা পরভরসায় থাকবে বলতে পারো ? নাচা গানা খানা পিনা ছেড়ে এবারে একটু বিজ্ঞানচর্চায় মন দাও সকলে।

**দেবগণ:** (সমস্বরে) অ্যাঁ ? বিজ্ঞান চর্চা ? এই বয়সে ?

**বিষ্ণু:** হ্যাঁ বিজ্ঞানচর্চা ! আর বয়স বলছ ? শেখার কি কোনও বয়স থাকে ? শিক্ষার কোনও বয়স নেই। মনে রেখো স্বর্গে অবিলম্বে বিজ্ঞানশিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার ! (চিত্রগুপ্তের দিকে তাকিয়ে) কী বল হে চিত্রগুপ্ত ?

**চিত্রগুপ্ত:** এক্কেরে হক কথা কইছেন ছ্যার... পড়াশুনা না কইর‍্যা এদের মাথাগুলান এক্কেবারে গোবরপোরা গন্ধমাদন হইয়া পড়সে ছ্যার....

**বিষ্ণু:** (দেবতাদের ব্যাজার মুখের দিকে তাকিয়ে) কেমন লাগলো আমার প্রস্তাব ? কী বলো হে দেবগণ ?

**সকলে:** (সমস্বরে) অতি উত্তম... সাধো সাধো... অতি উত্তম.. সাধো ঃ সাধো ঃ।

**চিত্রগুপ্ত:** (দর্শকদের দিকে তাকিয়ে) দ্যাখতাছেন, এইখানেতেও ফাঁকি ! অতি উত্তম সাধো ঃ সাধোঃ ! কেউ উচ্চারণ করিল পুরা, কেউ করিল, আধো ! আধো !

---

## বাল্মীকি

### পার্থ সিন্‌হা

এলেবেলে লোক নই বেলেতোড়ে বাড়ি
তরোয়াল দিয়ে কাটি খোঁচা খোঁচা দাড়ি !
নাম শুনে পাঁকে নেমে হাঁটুজল দ'য়ে —
বাঘ গরু একঘাটে জল খায় ভয়ে !
লম্বায় সাতফুট, চল্লিশ ছাতি
তুড়ি দিলে মানে মানে কেটে পড়ে হাতি !
বাইসেপ ফোলে যদি কব্জির চাপে —
ভয় পেয়ে বাইসন ঠক্ ঠক্ কাঁপে !
আধকিলো ছোলা, সাথে মিছরির পানা
সাতশোটা ডন দিয়ে খেয়ে যাই টানা !
লাঠালাঠি, মারপিটে ওস্তাদ হাত
বাঘাবাঘা পালোয়ান হয় কুপোকাত !
অনায়াসে তুলে ফেলি গোটা তালগাছ
ডাকাতির কেসে গেছি জেলে বার পাঁচ !
বাঘ কভু থাকে ভাই খাঁচা-ঘরে ভরা ?
জেলভেঙে কেটে পড়ি, সাধ্য কী ধরা !
পুলিশের খাতা খুলে দেখো পাবে নাম
খোঁজ পেতে দারোগার ছুটত যে ঘাম !
ইদানিং ঘরে বসে করি লেখা-লিখি
দস্যুতা ছেড়ে আমি — কবি বাল্মীকি !

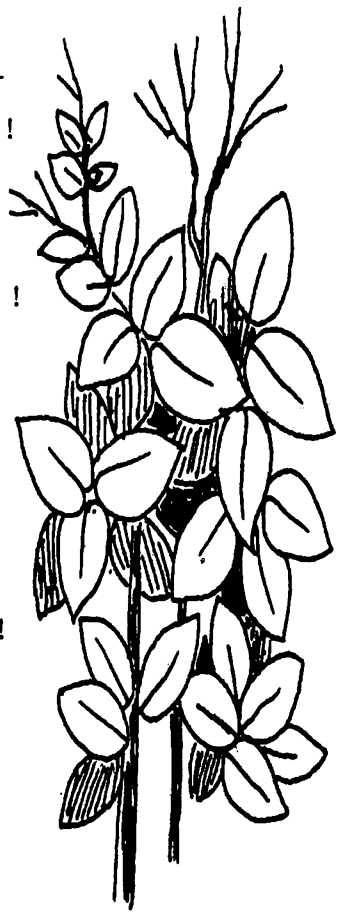

## ছড়া যে অচল

### ষষ্ঠীপদ পাল

আমার ছড়া পড়বে শিশু
এই কথাটা সত্যি ভেবে,
রূপকথারই বিষয় নিয়ে
লিখেই ভাবি, আঁকড়ে নেবে।

তিনটে শিশু উৎসাহে খুব
অল্পকথার ছড়া পড়ে,
বললে দাদু, কী লিখেছ
এই ছড়া কী মনে ধরে ?

নেই ডোরেমন, টারজানও নেই
টম-জেরিতো দেখলামই না,
এসব কিছু থাকলে না হয়
পড়তো কিছু ছানাপোনা।

কোন শিশুদের জন্যে আমি
কলম খাতা বাগিয়ে আজ,
লিখব ছড়া - রাখাল বালক
তেপান্তরের রাজরানি সাজ ?

যাচ্ছে না কেউ মেঘের দেশে
মাঠ পেরিয়ে কল্পলোকে,
বীরবেশে আর শিশুর ঘোড়া
টগবগিয়ে ছুটছে না যে !

গল্প

# গাছবন্ধু

## সুমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

টুম্পার কান্ডখারখানা দেখে সেদিন কিন্তু কেউই তেমন আমল দেয়নি। সবাই সেটাকে নহাৎ ছেলেমানুষের ছেলেখেলা বলেই ভেবেছিল।

কিন্তু সেই ছেলেখেলা যে আজকের মহাংসকটের জন্ম দেবে তা কে জানতো ?

টুম্পাদের বাড়িতে পূজা-আর্চার ধুমধাম বরাবরই। বাড়ির সবাইয়ের ঠাকুর দেবতার প্রতি ভক্তি যথেষ্ট। পুজোর সময় যে কটি লোক বাড়িতে থাকে তাদের প্রত্যেকেরই ঠাকুর ঘরে হাজির থাকা এবাড়ির নিয়ম।

সেবারে কী একটা পুজোর প্রসাদী আমের একটা আঁটি খেয়ে টুম্পা যেই সেটি বাড়ির নর্দমায় ছুড়ে ফেলতে যাবে অমনি হাঁ হাঁ করে উঠলেন টুম্পার মা। "ও কি টুম্পা ! তুমি ওটা নোংরা নর্দমায় ফেলছো কেন ? ওটা যে ঠাকুরের পুজোর আমের আঁটি। ওটা যেখানে সেখানে ফেললে ঠাকুর পাপ দেবেন যে।"

মায়ের কথা শুনে টুম্পা ভীষণ অবাক হয়ে গেছিল সেদিন। কী যে বলে মা। আঁটি আবার পুজোর কী ? পুজো করে তো আমটাকে, আঁটিটাকে তো নয়। বাবা তো বাজার থেকে আম কিনে এনে বলে, "এই আমগুলো পুজোর জন্যে।" কই বাবা তো বলে না আঁটিগুলো পুজোর জন্যে।

তবে মায়ের কেন যে অমন বারণ কে জানে। মনে মনে এসব কথা ভাবলেও মুখ ফুটে অবশ্য কিছুই টুম্পা বলতে পারে না। অবাক চোখে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

মা আবার বলে ওঠেন, "যাও সোনামা আমার, ওটা এমন একটা জায়গায় ফেলে এসো যাতে কারুর না পা ঠেকে।"

সমস্যায় পড়ে যায় এবার টুম্পা। সত্যিই তো। কোথায় ফেলে সে এবার এটা ? বাগানে ফেলবে তো বাগান নোংরা হবে আর নির্ঘাৎ রাঙাকাকুর কাছে বকুনি খেতে হবে। তাহলে কী জঞ্জালের কড়ায় ? না ; ওটা তো নর্দমারই সমান। তবে কোথায় ? কিছুতেই কিছুই

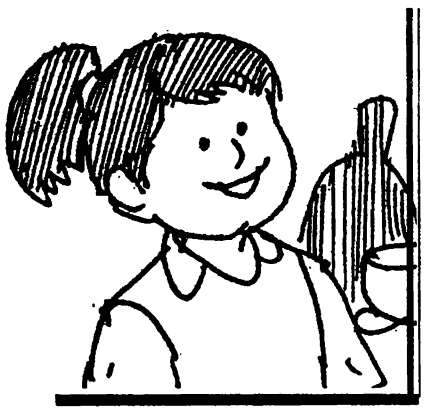

ঠিক করে উঠতে পারে না নয় বছরের ছোট ফুটফুটে মেয়ে টুম্পা।

নূপুর পরা ছোট্ট ছোট্ট পায়ে মিষ্টি শব্দ তুলে সে এসে দাঁড়ায় বাগানের কোলে লাল সিমেন্টে মোড়া রকটায়। হঠাৎ চোখ চলে যায় বড় টবটার দিকে। অনেকদিন আগে এক রবিবারে রাঙাকাকা একটা গোলাপ গাছ আর ঐ টবটা বাজার থেকে কিনে এনেছিল। তারপর থেকে কতো যত্ন, কত পরিশ্রমই না রাঙাকাকা করেছে গোলাপ গাছটার পেছনে। কিন্তু হতচ্ছাড়াটা একটা ফুলও দিল না। রাগটা অবশ্য টুম্পারই বেশি, কারণ সে মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল যে প্রথম ফুলটা সেই নেবে। কিন্তু তা আর হলো কই ? আস্তে আস্তে পাতাগুলো খয়েরি হতে হতে একসময় পুরো গাছটাই শুকিয়ে গেল।

তা ঐ পরিত্যক্ত টবটাকে দেখে টুম্পার মাথাতে একটা প্ল্যান খেলে গেল। আমের আঁটিটাকে ঐ টবে পুঁতে দিলে কেমন হয় ?

রাঙাকাকার থেকে পারমিশন পেতে দেরি হল না। উপরন্তু ভাইঝির আব্দার সামাল দিতে টব থেকে শুকনো মরা গাছটাকে তুলে ফেলে দিয়ে বেশ খানিকটা গর্তও খুঁড়ে দিল রাঙাকাকা।

টুম্পার মা তো টুম্পার কান্ড দেখে অবাক। বললেন, "বাব্বাঃ খুঁজে খুঁজে একটা জায়গা বের করেছিস বটে। চেষ্টা করেও কেউ পা ঠেকাতে পারবে না আর। মেয়ের আমার বুদ্ধি বটে।"

টুম্পা একমাথা চুল ঝাঁকিয়ে চোখ বড় বড় করে বলেছে, "জানো মা, এই যে আঁটিটা টবে পুঁতলাম, এ থেকে দেখবে কেমন গাছ হবে আর তাতে কত্তো আম হবে। আমি সেই আমগাছে চড়ব, দোল খাবো। তখন আমায় না জিজ্ঞেস করে কেউ কিন্তু আম পাড়বে না। দাদুর সেই ছেলে তাড়ানো ছড়িটা ছাদের ঘর থেকে বার করতে হবে।"

টুম্পার এসব কথা সেদিন যে শুনেছে সেই হেসেছে। মাঝে মাঝে কেউ কেউ তাকে জিজ্ঞেস করেছে, "কী গো টুম্পা রানি তোমার আম গাছে কবে আম হবে ? কবে খাওয়াবে ?"

টুম্পা বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বলেছে, "দাঁড়াও আগে গাছ হোক। তবে তো আম হবে।"

এদিকে দুবেলা টুম্পা নিয়ম করে টবে জল দিয়ে গেছে। কিন্তু তার এসব ছেলেখেলাকে কেউই সেদিন আমল দেয়নি। এর কিছুদিন পরে একদিন সকালবেলায় টুম্পাদের বাড়িতে মহা সোরগোল। সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে দাঁত মাজতে মাজতে বাগানে পায়চারি করা টুম্পার অভ্যাস। আর আজ পায়চারি করতে করতে ব্যাপারটা চোখে পড়েছে সর্বপ্রথম টুম্পারই।

জেঠু দেখে বললেন, "তা টুম্পা রানি ওটা যে আমগাছই বেরিয়েছে তা তুমি কী করে বুঝলে ?"

"বারে, আমি তো কিছুদিন আগে একটা আঁটি ঐ টবটায় পুঁতেছিলাম। তাহলে ঐ ছোট্ট গাছটা আমের নয়তো কার ?" টুম্পা জোর গলায় তার যুক্তি দেখায়।

জেঠুর কিছু বলার থাকে না। বাজারের ব্যাগ হাতে বেরিয়ে পড়েন বাজারের উদ্দেশ্যে। একের পর এক বাড়ির প্রতিটি লোককে মানে জেঠু থেকে কাজের লোক পদ্ম'র মা অবধি, সবাইকে হাত ধরে টেনে এনে সদ্য মাটির বুক চিরে মুখ তুলে দাঁড়ানো চারাটাকে সোৎসাহে দেখিয়েছে টুম্পা। আধ ইঞ্চি থেকে এক, তার থেকে দুই, তারপর তিন, তারপর পাঁচ- এইভাবে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছে সে টুম্পার স্নেহ যত্নে।

ইতিমধ্যে আবার চড়াই পাখি চারাটার কয়েকটা পাতা কেটে ফেলে দেওয়ায় টুম্পার সে কী কান্না আর চড়াইদের ওপর কী রাগ। তারপর কাটি আর সুতো দিয়ে অবশ্য রাঙাকাকা চারাটাকে ঘিরে দিয়েছে। চড়াইরাও আর নাগাল পায় না। তা দেখে টুম্পার কী মজা। কিছুটা বড় হবার পর দেখা গেল টুম্পার কথাই ঠিক। টবটা বেশ বড় বলে ফুট পাঁচেকের মতো গাছটা স্বচ্ছন্দে বেড়ে উঠল।

রোজ সকালবেলা উঠে টুম্পা মেপে দেখে সারা রাতে গাছটা কতটা বাড়ল। মায়ের থেকে ও জেনেছে যে গাছেরা রাতের বেলায় বড় হয়।

বেশ কয়েক মাস কাটার পর গাছটাকে মাটিতে পোঁতার প্রয়োজন। তাই রাঙাকাকাকে ধরে ম্যানেজ করে অবশ্য কিছুদিনের মধ্যেই গাছটাকে টব থেকে তুলে বাগানের একটা কোণে বসিয়েও নিয়েছে টুম্পা।

এই অবধি সব ঠিকঠাক চলছিল। অবশ্য মাঝে একবার জল দিতে গিয়ে একটা কাঁচের গ্লাস ভাঙার ঘটনাটা ছাড়া। কিন্তু বছর কয়েক কাটার পর ঝামেলা শুরু হল। গাছটা ততদিনে আলো, জল বাতাস আর টুম্পার ভালোবাসা পেয়ে বেশ ডাগর হয়ে উঠেছে।

টুম্পাও সময় পেলে গাছটার কাছে যায় আর তার সাথে যত রাজ্যের গল্প জুড়ে দেয় আর টুম্পার আমগাছটাও হেলে-দুলে ঘাড় নেড়ে সাড়া দেয়। গাছ-বন্ধুর সঙ্গে টুম্পার দিনগুলো এমনিভাবে বেশ আনন্দেই কেটে যাচ্ছিল। পাড়ার ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে তো টুম্পাকে মিশতে দেওয়া হয় না। কারণ ওই বুচু, বিল্লি, মামন, খেঁদি, টুকিদের সঙ্গে মিশলে টুম্পা নাকি খারাপ হয়ে যাবে। টুম্পা অবশ্য খারাপ হয়ে যাবার

ব্যাপারটা মোটেই বুঝে উঠতে পারে না। ও তাই মা'কে জিজ্ঞেস করেছিল, "মা ওদের সঙ্গে মিশলে আমি খারাপ হয়ে যাবো ? কেমন করে হবো ? আমার গায়ের রংটা বুঝি কালো হয়ে যাবে ? মুখটা বুঝি বিচ্ছিরি হয়ে যাবে ? নাকটা বুঝি থেবড়ে যাবে ?... এমনি সব কত প্রশ্ন।"

কোন উত্তর না পেয়ে টুম্পা আবার বলেছিল, "কিন্তু মা, ঐ বাড়ির পাপ্পা আর বাপ্পা তো ওদের সঙ্গে রোজ বিকালে খেলা করে, কই ওরা তো পালটায় নি আগের মতোই তো আছে।" টুম্পার গলায় বিস্ময়ের সুর।

টুম্পার মা এবার বিরক্ত হয়ে ওঠেন, "আমি বাবা অত তোমার প্রশ্নের জবাব দিতে পারি না, বকতে পারি না, আমায় এখন কাজ করতে দাও তো। তোমার বাবা এক্ষুণি ভাত চাইবে।"

জবাব টুম্পা পায় নি। আর ওদের সঙ্গে বন্ধুত্বও গড়ে ওঠেনি। তাই গাছটার সঙ্গে বন্ধুত্ব গাঢ় হতে ওর দেরি হয়নি। হঠাৎ একদিন জেঠু বলে উঠলেন "হুঁ, গাছটা দেখছি বেশ বেড়ে উঠেছে। আর দু'দিন পর থেকেই ছেলে-ছোকরাদের উৎপাত শুরু হবে। কবে বলতে কবে আম ধরে বসে থাকবে। তার চেয়ে বরং আগেভাগেই কেটে দেওয়া ভাল। কে পরে ঝামেলা পোহাবে ?"

টুম্পার জেঠুর কথা অবশ্য ভুল কিছু নয়।

কয়ের বছর আগে অবধি যখন টুম্পার দাদু ও বাড়িতে ছিলেন তখন এ বাড়িতে ফলের গাছ কয়েকটা ছিল। পেয়ারা গাছ, লেবু গাছ, জাম গাছ — এসব আরকী। তা সেসবের ফল যা পাওয়া যেত তা নিতান্ত আর কিছু নয় আর তার জন্য হান্ড্রেড পারসেন্ট ক্রেডিট ঐ টুম্পার সত্তর বছরের জোয়ান দাদুটার প্রাপ্য। সারা দুপুর বিখ্যাত ছেলে তাড়ানো লাঠিটা নিয়ে বাগানে পায়চারি করতেন দাদু।

সেকালের ঘি-দুধ খাওয়া শরীরের কী তেজ। গলার কী জোর। তা সেই হাঁকডাকের জোরেই একদিন চৌধুরীবাড়ির ফল-পাকুড় রক্ষা পাচ্ছিল। কিন্তু এখন ? এখন সে দাদুও নেই আর সেই হাঁকডাকও নেই। তাই টুম্পার জেঠুর যুক্তিটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

এ আমগাছে ফল ধরলে কী হবে ? কে চেঁচাবে ? কে ঝগড়া করবে ? সামান্য একটা আমগাছ নিয়ে শেষে পাড়ার লোকের সঙ্গে মনোমালিন্য হবে। টুম্পা জেঠুর ঘোষণা শুনে কেঁদেই অস্থির।

টুম্পার সেই এক কথা, "না তোমরা আমার গাছ কাটবে না, হাত দেবে না। ওটা আমার গাছ, ওতে আম হবে, আমি দোল খাবো।"

ঘুমের ঘোরেও মাঝে মাঝে টুম্পা আমার গাছ, আম খাবো ইত্যাদি ইত্যাদি বলে উঠতে লাগল।

বাড়ির সবাই মহা চিন্তায় পড়ে গেল। তাইতো কী করা যায় এখন ? ও গাছ রেখে দেওয়া মানে তো শুকনো ঝঞ্ঝাট ডেকে আনা। রোজ রোজ হৈ হৈ। দুপুরবেলা কারুর দু'চোখের পাতা এক করার জো থাকবে না। আশে পাশের লোকদেরও অসুবিধা করা। তাছাড়া কাউকে বিশেষ কিছু বলার জো নেই। বললে পরে হয়তো গেরিলা পদ্ধতিতে আক্রমণ চলবে বাড়ির ওপর। দরজার ওপর শক্তি প্রয়োগ। রাত্রিবেলা ইট, এমনি আরও কত কলাকৌশল আর সূক্ষ্ম বুদ্ধির প্রদর্শনী। কিন্তু এদিকে আবার টুম্পা। কে আর চায় শিশুর মনে কষ্ট দিতে। বাড়ির মধ্যে তো ঐ একটাই মেয়ে। সবার নয়নের মণি।

তাই চৌধুরী পরিবার উভয় সংকটে পড়ে গেছে আজ। এদিকে আমের বোল ধরার সময় হয়ে আসছে। গাছটা যেরকম বেড়ে উঠেছে তাতে বোল ধরে গেলে আবার করার কিছু থাকবে না। আর তখন বোল ধরা গাছ কাটাও যাবে না। সামনে পরীক্ষা আসছে। গাছ -গাছ করে তো পড়াশোনা গোল্লায় যাচ্ছে। দিনরাত শুধু ঐ এক চিন্তা। এমন করলে ইস্কুলে পজিসন্ বজায় রাখবে কী করে টুম্পা ? ওর মা দুশ্চিন্তার সাগরে তলিয়ে যান।

সত্যি, সামান্য একটা ব্যাপার থেকে কী ঘটে গেল। কে জানে আরো কী অপেক্ষা করছে ?

অনেক ভাবনা চিন্তার পর টুম্পার জেঠু ঠিক করলেন যে দিনের বেলায় তো গাছের পাতাটিও স্পর্শ করা যাবে না, তাই রাতের বেলায় যা করার করতে হবে। সকালে টুম্পাকে বলে দিলেই হবে যে রাতে ঝড়ে গাছ পড়ে গেছে।

রাত্রি নিশুতি। চারিদিকে ঝিঁঝিঁর কনসার্ট। আকাশে আধখানা চাঁদ আর চুমকির মতো অসংখ্য তারা-নক্ষত্র। পূর্বদিকের দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন টুম্পার জেঠু বিশ্বনাথবাবু, হাতে কাঠের বাঁটওয়ালা কাটারি। ধীর পায়ে এসে দাঁড়ালেন বাগানে। চারিদিকে নানান গাছ ঘেঁষাঘেষি করে দাঁড়িয়ে আছে। চাঁদের মৃদু আলো পাতার ফাঁক দিয়ে টুকরো টুকরো হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। অদ্ভুত এক মায়াবি পরিবেশ বিশ্বনাথবাবুকে রোমাঞ্চিত করে তোলে। ধীর পায়ে কাটারি হাতে টুম্পার গাছ-বন্ধুর সামনে এসে দাঁড়াল। কেমন এক আলো -আধারি পরিবেশ। বাগিয়ে ধরলেন কাটারির বাঁটকে। মনে পড়ে গেল টুম্পাকে।

বিষন্ন চোখে মুখ তুলে তাকালেন গাছটার দিকে। আর তখনই ঘটনাটা ঘটে গেল। হঠাৎ ঝাপসা দেখলেন, শরীরটা যেন কেমন করে উঠল। ওনার মনে হলো যেন গাছটার ডাল-পালার ফাঁকে টুম্পার মুখটা দেখতে পেলেন।

যেন উঁকি মারল সে। চোখ কচলে নিলেন। আবার বাগিয়ে ধরলেন হাতিয়ার। কিন্তু আবার... আবার চোখে কেমন ঝাপসা দেখলেন। মনে হল গাছটার পিছনে টুম্পা। সে আর গাছ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। হাতটা কেমন যেন অবশ হয়ে এলো।

মনে কেমন অন্য একটা চিন্তা উঁকি মারল। একবার গাছটার কথা, তার তরতরিয়ে বেড়ে ওঠাকে আর একবার টুম্পার কথা, তার আশা-ভালোবাসা-স্বপ্নকে। সত্যিই তো। গাছটা আর মেয়েটা মিলে একাকারই হয়ে গেছে। একটাকে ছেড়ে আর একজনকে ভাবা যায় না। দুজনেই তো একই বাড়িতে, আলো বাতাসে বড় হয়ে উঠছে। বাড়ির বড় হলে যেমন বাড়ির নানা কাজে লাগে তেমনি এ গাছ বড় হলে তো একদিন ছায়া দেবে, বাতাস দেবে ফল দেবে। এ তো বাড়ির মেয়ের সমান। এই মুহূর্তে গাছ নিয়ে ভবিষ্যৎ গোলমাল চিন্তাটা তেমন একটা বড় হয়ে উঠল না তাঁর কাছে।

অন্তরের কোথা হতে যেন মধুর স্নেহ অনুভব করেন গাছটার জন্য। আর একটা শিশুর আন্তরিক চেষ্টা, নিষ্ঠা আর স্বপ্নকে ভেঙে চুরমার করে দিতে তিনি কোথা থেকে যেন বাধা পান। হাতের কাটারি হাতেই থেকে গেল। কাজে লাগাতে গিয়েও পারলেন না। হেরে গিয়েও বুক ফুলিয়ে ফিরে চললেন তিনি।

## লিমেরিক

### ভাগ্যধর হাজারী

পেঁয়াজ কোথায় ? গিন্নি চেঁচান, কর্তা দেখেন সর্ষেফুল
মিষ্টি হেসে কর্তা বোঝায় — পেঁয়াজ এখন চক্ষুশূল।
ঝাঁঝ বেড়েছে দামের চোটে
যায় না ছোঁয়া পেঁয়াজ মোটে
নিরামিষের ভজন করো — রক্ষা পাবে সর্বকুল।


মানস দরিপার
ছড়ার বই
ছড়ার হাট জমজমাট
প্রকাশিত হয়েছে
পত্রাবলী
২৪এ, কলেজ রো কলকাতা- ৭০০ ০০৯

## দুঃখপুরের ছড়া

### গোপাল কুম্ভকার

দুঃখপুরে বসত যাদের সেই শিশুদের জন্যে আমি
লিখছি ছড়া জ্যোৎস্না-মাখা মন দিয়ে খুব দিবস-যামি
অভাব যাদের নিত্য-সাথী, শিশু শ্রমিক খাটছে যারা
ভাবছি তাদের আঁধার কেটে ফুটবে কখন চন্দ্র-তারা।

আদত যাদের বর্ষাকালে ভাঙ্গা কুঁড়েয় ভিজতে থাকা
কিংবা শীতে নেইকো যাদের গা বাঁচাতে পোষাক রাখা
সেই শিশুদের জন্যে এখন গরমাগরম লিখছি ছড়া
হয়তো ভালো লাগতে পারে মিষ্টি যেমন তালের বড়া।

অবুঝ মনের সবুজ খাতায় অসাম্যতার দেখছি ছবি
অভাবপুরের আকাশ জুড়ে মেঘেই ঢাকা দীপ্ত রবি
সেই আঁধারের পর্দা ছিঁড়ে আনবো তুলে ছড়ার মালা
পথ্-শিশুদের কোমল হাতে তুলেই দেবো বরণ ডালা।

ওদের কথা কেউ ভাবেনা, দেখায় না কেউ পথের দিশা
বাধ্য হয়েই অন্ধকারে কাটায় ওরা দিবস-নিশা
একটু নজর দিলে ওরাও হতেই পারে মহীরুহ
সাহস জোগান পেলে ওরাও ভাঙতে পারে বিশাল বুহ।

আইন আছে আইন মাফিক, কার্যকরী হয় না জানি
দেখেও সবাই অন্ধ থাকি-মুখে তবু ছড়াই বাণী
আসলকথা-শেকড়টাতেই খুঁজতে হবে সুত্রখানা
মিলবে তবেই রহস্য এর, ছাড়তে হবে টালবাহানা।

## অলীক বনের ঈশ্বর

### মালিপাখি

এই বাড়ালাম হৃদয় মোহর, এইতো রোদের পুচ্ছো
চোখের পাতায় সাজিয়ে হাসে হরিণ ঘাসের ইচ্ছে।
হাত রেখেছি বুকের ওপর, হঠাৎ বুকের মধ্যে ;
যুঁই পাখিরা নাচতে থাকে... সবাই যেন পদ্য।
এমনি ক'রে দিন বাড়ে আর এমনি ক'রেই সূর্য,
দিঘির পাড়ে চাঁদকে পড়ায় পারুল চিঠির গুচ্ছো।
জল ছবিরা কুশল জানায়। নতুন নতুন দৃশ্যে-
স্নান করিয়ে দেয় আমাকে অলীক বনের ঈশ্বর !

# বাংলাদেশের লেখা

## পাখির ডাকে

**মঈন মুরসালিন**

পাখির ডাকে রাত পোহালো
পাখির ডাকে ভোর
পাখির ডাকে ফুলের বাগান
খুলে আপন দোর।

পাখির ডাকে সূর্য হাসে
পাখির ডাকে চাঁদ
পাখির ডাকে অথৈ সাগর
দেয় খুলে তার বাঁধ।

পাখির ডাকে জেগে ওঠে
ঘুমিয়ে থাকা মন
পাখির ডাকে এসো করি
নিজেকে গড়ার পণ।

## মেঘের মেয়ে

**নাসিরুদ্দীন তুসী**

ধুলোটে মেঘ, তুলোটে মেঘ, কালো মেঘের সারি
শোনো ওগো মেঘের মেয়ে, কোথায় তোমার বাড়ি ?

কেবল ছুটোছুটির খেলা
দাও কাটিয়ে সারা বেলা
যাচ্ছো নাকি তেপান্তরে দিয়ে সাগর পাড়ি ?
এলোচুলের মেঘের মেয়ে
কালো মেঘের ডিঙি বেয়ে —
গোমড়া মুখে যাচ্ছো কোথায় দূর পাহাড়ের দেশে ?
ফেরার সময় বেড়িয়ে যেও আমার ঘরে এসে।

মেঘের মেয়ে, মেঘের মেয়ে, হাতটি তোমার ধরে —
ইচ্ছে করে হারিয়ে যেতে দূরের তেপান্তরে !

## কুসুমপুর

**জসীম মেহবুব**

কুসুমপরি কুসুম-কুসুম
ডিমের কুসুম চাখে
পটলচেরা চোখ দুটোতে
পরখ করে মাকে।

একটু দূরে আব্‌বুটা তার
হাসছে মিটিমিটি
ময়না টিয়ে খাঁচায় বসে
বাজায় জোরে সিটি।

সেই সিটিতে কুসুমপরি
চমকে ওঠে যেই
সুযোগ বুঝে বিল্লি পালায়
ডিমের কুসুম নেই।

কুসুম খোঁজে কুসুমপরি
কুসুম পাবে কই ?
কুসুম চাখে বিল্লিছানা
খাটের নীচে ওই।

# কুম্ভকর্ণের ঘুম

## খন্দকার মাহমুদুল হাসান

রাম-রাবণের যুদ্ধের কথা কি জানো তোমরা ? সে এক ভীষণ যুদ্ধ। সেই যুদ্ধের কথা লেখা আছে বিখ্যাত মহাকাব্য রামায়ণে। মহাকবি বাল্মীকির লেখা বিশাল মহাকাব্যটিতে সাতটি খন্ড আছে। একেক খন্ডের নাম হলো কান্ড। সেই কান্ড বা খন্ড গুলো হলো - আদিকান্ড, অযোধ্যাকান্ড, অরণ্যকান্ড, কিষ্কিন্ধ্যাকান্ড, সুন্দরকান্ড, লঙ্কাকান্ড এবং উত্তরকান্ড। আসলে ঐ যুদ্ধ শুধু নয়, অযোধ্যার ইক্ষাকু বা সূর্যবংশীয় রাজা দশরথের বংশের বিশেষ করে দশরথের বড় ছেলে রামচন্দ্রের কাহিনিই জুড়ে আছে মহাকাব্যময়। রামের জন্ম এবং ছোটবেলাকার ঘটনা নিয়ে রচিত হয়েছে আদিকান্ড। রাম, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন এই চার ভাইয়ের মধ্যে বড় ছিলেন রামচন্দ্র। রামের মা ছিলেন কৈশল্যা। ভরতের মা ছিলেন কৈকেয়ী। লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের মা ছিলেন সুমিত্রা। অন্য মায়ের সন্তান হলেও রামকে সব ভাই খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন। দশরথের পরে রাজা হওয়ার কথা ছিল বড় ছেলে রামচন্দ্রের। কিন্তু ভরতের মা কৈকেয়ী চেয়েছিলেন, রাম না হয়ে ভরত রাজা হোক। তিনি দশরথকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন যে, তার একটি কথা তিনি রক্ষা করবেন। রামের যখন রাজা হওয়ার সময় হলো। তখনি তিনি সেই কথাটা বললেন। কথাটা ছিল, রাম বারো বছরের জন্য বনবাসে যাবেন। আর রাজা হবেন ভরত। ওদিকে রাম ছিলেন ধর্মপ্রাণ। তাই তিনি "পিতৃসত্য" পালন করতে গিয়ে সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে বনবাসে গেলেন। অনিচ্ছাসত্বেও রামভক্ত ভরত তখন রাজা হলেন, কিন্তু রামের পাদুকা সিংহাসনে রেখে তিনি রাজ্য চালাতে লাগলেন। অযোধ্যা থেকে রামের বনবাসে যাওয়া পর্যন্ত ঘটনার বর্ণনা আছে অযোধ্যাকান্ডে। বানররাজ সুগ্রীবের সাথে রামের বন্ধুত্বের কাহিনি

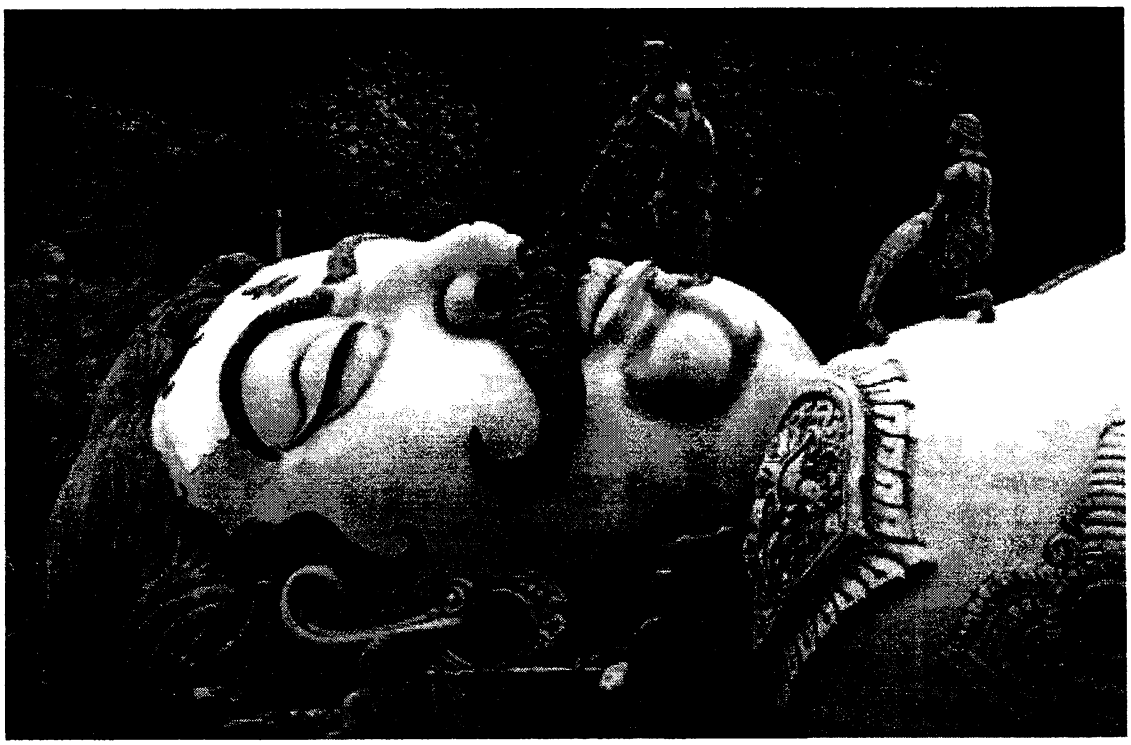

লেখা আছে কিষ্কিন্ধ্যাকান্ডে। ছোট ভাই লক্ষ্মণ ও রামের স্ত্রী সীতাও রামের সাথে বনবাসে গিয়েছিলেন। ওদিকে লঙ্কায় তখন ছিল রাক্ষসদের রাজত্ব। রাক্ষস রাজার নাম ছিল রাবণ। সে ছলনা করে সীতাকে বনের ভেতর থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। এই নিয়ে রামের সাথে তার শত্রুতার সৃষ্টি হয়। রাম তখন সুগ্রীবের সাহায্য নিয়ে মস্ত সেনাদলসহ সাগর পাড়ি দিয়ে আক্রমণ করেন লঙ্কাপুরী। সৈন্যদলসহ রামের লঙ্কায় হাজির হওয়ার ঘটনা বর্ণিত আছে সুন্দরকান্ডে। লঙ্কায় রাম আর রাবণের বাহিনীর ঘোরতর যুদ্ধ হল। সেই যুদ্ধের কাহিনি লঙ্কাকান্ডে বর্ণিত আছে। যুদ্ধে জিতে অযোধ্যায় এসে সিংহাসনে বসার পর অবশ্য সীতাকে রাম বনবাসে পাঠিয়েছিলেন। সেখান রাম সীতার দুই ছেলে লব-কুশের জন্ম হয়েছিল। শেষের এসব ঘটনা উত্তরকান্ডে বর্ণিত আছে।

লঙ্কাকান্ডে রাবণের সাথে রামের যুদ্ধ শুধু নয়, যুদ্ধে রাবণের চূড়ান্ত পরাজয়, সীতা উদ্ধার এবং রারণের পক্ষত্যাগকারী ভাই বিভীষণকে রাবণের জায়গায় রাজা বানিয়ে রামের অযোধ্যায় ফিরে আসার কাহিনিও বর্ণিত হয়েছে। যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে রাবণের ছোট ভাই কুম্ভকর্ণের অংশগ্রহণ ছিল গুরুত্বপূর্ণ। সে ছিল মহাবীর, কিন্তু ব্রহ্মার কাছে বর চাওয়ার সময় দেবী সরস্বতীর ইচ্ছায় তার জিভ আড়ষ্ঠ হয়ে গিয়েছিল। সে ইন্দ্রাসন চাইলেও জিভের সমস্যার কারণে শোনা গিয়েছিল নিদ্রাসন। তাই তার জন্য নিদ্রাসনই বরাদ্দ হয়েছিল। এ কারণে সে বছরের ছয় মাস ঘুমিয়ে থাকত। আর উঠে ভীষণ ক্ষুধার্ত অবস্থায় যা পেত তাই খেত। লঙ্কায় যখন যুদ্ধ শুরু হয় তখন সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল। রাক্ষসরা ভীষণভাবে চেঁচিয়ে ঢাক-বাদ্য বাজিয়ে উট-ঘোড়া-গাধার মতো প্রাণীদের দিয়ে সমস্বরে আওয়াজ করিয়ে কিছুতেই যখন তার ঘুম ভাঙাতে পারল না, তখন তার বুকের ওপর দিয়ে হাতির দলকে হাঁটিয়ে নিল। এবারে কুম্ভকর্ণ একটু সুড়সুড়ি অনুভব করল এবং শেষে তার ঘুম ভাঙল। সবকিছু শুনে সে যুদ্ধে অংশ নিল। তখন রাম কুম্ভকর্ণের দিকে উন্নত যুদ্ধাস্ত্র নিক্ষেপ করতে লাগলেন। ফলে একে একে তার হাত পা সব কাটা পড়তে লাগল এবং শেষ পর্যন্ত সে মারা গেল। এই ঘটনায় রামের লঙ্কা বিজয় নিশ্চিত হয়ে গেল।

যাই হোক, রামায়ণের এই কাহিনি উপমহাদেশের সব অঞ্চল তো বটেই ইন্দোনেশিয়া-কম্বোডিয়া সহ আরও বহু দেশে হাজার হাজার বছর ধরে জনপ্রিয়। এই মহাকাব্য থেকেই বাংলা ভাষায় কুম্ভকর্ণের ঘুম কথাটার প্রচলন হয়েছে। দীর্ঘনিদ্রা-অলসতা-দায়িত্বহীনতা-উদাসীনতা বোঝাতে আমাদের ভাষায় এ কথাটা ব্যবহৃত হয়।

## ওগো মা স্বদেশ

### আসলাম সানী

তোমার কাছে থাকতে চাই
তোমার ধুলো মাখতে চাই
তোমার ছবিই আঁকতে চাই
প্রিয় আমার দেশ ধন্য ধন্য বেশ,
তোমার পথে চলতে চাই
তোমার কথাই বলতে চাই
তোমার মতোই জ্বলতে চাই
জন্ম ধন্য বেশ প্রিয় বাংলাদেশ,
তোমার মতোই হাসতে চাই
তোমায় ভালোবাসতে চাই
তোমার কাছেই আসতে চাই
ছড়াও শান্তি রেশ ওগো মা স্বদেশ।

## জাতির জনক

### ইমরান পরশ

মধুমতির কোল ঘেঁষে রয় টুঙ্গীপাড়া গ্রাম
বাংলাদেশের ইতিহাসে অমর সে এক নাম।
এই গাঁয়েতে জন্মেছিলেন সেই সে মহানায়ক
তিনি হলেন ঐহিতাসিক স্বাধীনতার গায়ক।

সাতই মার্চে দেন শুনিয়ে তাঁর সে অমর গান
বীর বাঙালি ধরল বুকে স্বপ্ন অফুরান।
স্বপ্নে আঁকা স্বদেশ পেলাম সেই গায়কের জন্য
লাল সবুজ এই জমিন পেয়ে বিশ্বে হলাম গণ্য।

সেখ মুজিবুর নামে তাঁকে আমরা সবাই চিনি
বাংলাদেশের ইতিহাসে জাতির জনক তিনি।

## শরতের গান

### নীহার মোশারফ

হাসনাহেনা কেয়ার ঘ্রাণে নদে কাঁপন জাগে
শিশুবেলার ছন্দ নাচে গানের অনুরাগে।
হাজার পাখি টোনাটুনি কাশের বাগান ঘিরে
মিষ্টি বিকেল ফুরফুরে হয় শরতবাবুর নীড়ে।

## কাকার কান্ড

### শ্যামাচরণ কর্মকার

আমরা অবাক কান্ড দেখে গাঁয়ের হারু কাকার
কেউ জানি না কারণটা কী টর্চটা হাতে রাখার।
দিন-রাত্তির হারু কাকার দু'চোখ থাকে বন্ধ
কারণ তিনি কপালদোষে জন্ম থেকেই অন্ধ।
বাইরে যখন বেরোন কাকা সন্ধেবেলায়, রাতে
ভোলেনা না তো একখানা টর্চ নিতে মশাই হাতে।
কান্ড দেখে সবাই ভাবি, অন্ধ যখন কাকা
মিছিমিছি টর্চটা তবে সঙ্গে কেন রাখা ?
কারণটা কী জানতে গেলে বলেন তিনি হেসে,
চোখ থাকতেও অন্ধ মানুষ আছে অনেক দেশে।
টর্চটা জ্বেলে পথ চলি তাই নামলে অন্ধকার —
লোককে আমি দেখাই আলো করতে হুঁশিয়ার।
ধাক্কা থেকে রোজ বেঁচে যাই টর্চটা সরায় লোক
কান্ড শুনে অবাক দাদা, ছানাবড়া চোখ !

## ভূত নেই

### রামচন্দ্র ধাড়া

মা বললেন, "ভূত দেখেছি অমাবস্যার রাতে !
পা ঝুলিয়ে বসেছিল চিলঘরের ছাতে।"
"ভূত নেই মা", ছেলে বলে,
"মনের মধ্যে ভয়ের ফলে
মানুষ দেখে ভূত-পেত্নী – সন্দেহ নেই তাতে" !!

## লিমেরিক

### সুকান্ত ঘোষ

সেগুন গাছে বেগুল ফলান অনেক গবেষণায় মামা
আহ্লাদে খুব ফলাও করে বলল হেসে ভাগ্নে রামা।
সেই বেগুনের অনেক যে গুন
ঘষলে কাঠে লাগে না ঘুন
একটা ছোট গাছের থেকেই হয় যে বেগুন এক ধামা।

## দেখতে পেলাম

### শঙ্করকুমার চক্রবর্তী

দেখতে পেলাম, এমন মানুষ
কয় না কথা কারো সাথে,
কামারশালায় ঠুক্-ঠুকা-ঠুক্
কাজ করেই তার জীবন কাটে।

দেখতে পেলাম, একটা পুকুর
আগে ছিল জলে ভরা,
এখন তার শরীর জুড়ে
নোংরা আবর্জনার জ্বরা।

দেখতে পেলাম একটা গাড়ি
আগে ছুটতো রাস্তা দিয়ে,
মুখ থুবড়ে এখন পড়ে
ফাটা-ফুটা শরীর নিয়ে।

দেখতে পেলাম কোকিল কালো
গাছের ডালে গাইছে গান,
বসন্তে তার খুশির আমেজ
চোখের কোণে খুশির টান ।

## হারিয়ে গেছে

### অরুণ মণ্ডল

হারিয়ে গেছে ছেলেবেলা রূপকথাপুর
কল্পনার তেপান্তরের মাঠ
ঘুমের মধ্যে ভেসে ওঠে সেই কবেকার
গল্পে শোনা তিরপূর্ণির ঘাট।

হারিয়ে গেছে ঠাম্মি দাদুর গল্প বলা
ভয় জাগানো বৃষ্টি রাতেঃ
ওরা যে আজ গ্রামের বাড়ি মাধবপুরে
একলা আমি নিজের সাথে।

হারিয়ে গেছে ছেলেবেলার অনেক কিছু
সবুজ মনের স্বপ্ন আঁকা —
পড়ার চাপে ক্লান্ত হয়ে খুঁজতে থাকি
পথ হারানো সেই রূপকথা।

# গুহকসখা

## সতীশ বিশ্বাস

গঙ্গাস্নানে চলেছেন রাজা দশরথ
সঙ্গে তাঁর চারপুত্র
বয়সে যদিও ক্ষুদ্র।
পুণ্যলোভে নয়; লক্ষ্য ঃ
প্রকৃতির সাথে সখ্য;
হঠাৎ নারদমুনি আগলান পথ।
মুনি তাঁকে প্রশ্ন করে, "চলেছ কোথায় ?"
রাজা বলে খুশি প্রাণে,
"বেরিয়েছি গঙ্গাস্নানে।"
মুনি বলে, "এ কী কথা !
এ যে ঘোর অজ্ঞানতা।
জানো না কী, পুণ্যপ্রাপ্তি-রামের কৃপায়।
দেখলে রামের মুখ গঙ্গাস্নানে আর
নেই দরকার ।
কতটুকু পুণ্য ওই
গঙ্গার জলে ?
গঙ্গার জন্মই তো রাম-পদতলে।
মনে রেখো-ভগবান পুত্রটি তোমার।"
ঘাবড়ে গিয়ে দশরথ ফিরতে চায় বাড়ি।
রাম বলে, "বাবা শোন,
নেই এর মূল্য কোন।
মা-গঙ্গার মহিমা কী,
মুনিবর জানে তা কি ?
আর দ্বিধা নয়, চলো স্নানে তাড়াতাড়ি।"
পুত্রের কথা শুনে পিতা খুশি হন।
হাঁটেন গঙ্গার দিকে—
হঠাৎ সে পথটিকে
ঘিরে ফেলে উত্তাল
গুহক সে চন্ডাল ;
আর শত কোটি চন্ডাল সৈন্যগণ।
গুহক বলেন, "রাজা আছে অভিযোগ।
যখনই এ পথ দিয়ে
ফিরে যান সৈন্য নিয়ে
হয়ে ভারসাম্যহারা
ক্ষয় ক্ষতি করে তারা।
ভুগতে হয় বিনা দোষে দারুণ দুর্যোগ।"
রাজা বলে, "বন্ধ করো ক্ষোভবর্ষণ।
যেতে দাও গঙ্গাস্নানে
বড়ই আগ্রহ প্রাণে।"
গুহক তখন বলে,
"গঙ্গাস্নানে যেতে হলে —
আমাকে করাও আগে শ্রীরামদর্শন।"
বলেই গুহক জোরে "রাম রাম" ডাকে।
ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে রাজা
ভাবে এ কেমন সাজা।
এমনি স্নিগ্ধ প্রাতে—
পড়লাম এ কার হাতে।
রামকে রথের মধ্যে ঢেকেঢুকে রাখে।
ধনুর্বান হাতে নিয়ে রাজা ভাবে মনে,
চন্ডালকে যদি মারি,
হবে তাতে নিন্দে ভারী
আর যদি কোন ফেরে
যুদ্ধে আমি যাই হেরে
অপযশ রটে যাবে বিশ্বভুবনে।
কিন্তু ছাড়ে না পথ গুহক বর্বর
দারুণ নাছোড়বান্দা
সাথে আছে অন্য ধান্দা।
মনে মনে ভেবে রাজা,
গুহককে দিতে সাজা —
ধনুকেতে জুড়লেন "পাশুপত শর"।
শন্-শন্-চোখের নিমেষে তির গিয়ে
বাঁধে তার হাত গলা,
বন্ধ করে কথা বলা।
কিন্তু তখনও ক্রুদ্ধ

গুহক চালায় যুদ্ধ —
ধনুকে ছুড়তে থাকে তির দু-পা দিয়ে।
বিস্মিত ভরত গিয়ে রামকে তা বলে।
শুনে সে অদ্ভুত কথা
রাম ছুটে আসে তথা;
কৌতূহলে কিছুক্ষণ
দেখে সে নিপুণ রণ।
ভাবতে থাকে — এই বিদ্যা শিখব কী কৌশলে।
গুহক দেখতে পেল — সামনে শ্রীরাম।
উল্লসিত হল প্রাণ,
ছেড়ে দিয়ে ধনুর্বান —
মেটাতে মনের সাধ,
পেতে তাঁর আশীর্বাদ,
গুহক রামকে করে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম।
গুহকের চোখে এল ভাবাবেগে জল।
রাম তার ভক্তি দেখে
তুলে তাকে মাটি থেকে
বলে, "সুখী হও; তবে
আমাকে শেখাতে হবে
পায়ে তীরধনু চালাবার কৌশল।
গুহক তখন গতজন্মের কথা
বলে শ্রীরামের কাছে,
শ্রীরামকে দিতে সূত্র।
গুহক সে জন্মেছিল
হয়ে বশিষ্টের পুত্র
বামদেব; ছিল বড্ড কম অভিজ্ঞতা।
অন্ধক মুনির পুত্র সিন্ধুকে একদিন
হরিণশিকারে গিয়ে
দশরথ বাণ দিয়ে
বিদ্ধ করে তার দেহ।
জানলো না আর কেহ
কোলে তুলে আনে রাজা দেহ-প্রাণহীন।
পাপ থেকে মুক্তি দিতে বামদেব তখন
নেহাত অজ্ঞতাবশে
রাজার নিকটে গিয়ে
রাজার কানের কাছে
মুখটি নামিয়ে নিয়ে
তিনবার রামনাম করে উচ্চারণ।
এক কোটি ব্রহ্মহত্যা ঘোচে একবারে
সেখানে এ অর্বাচীন
একের বদলে তিন।
এ তো রীতিমত পাপ,
বাবা দেন অভিশাপ —
পরজন্মে চন্ডাল হবি রে সংসারে।"
বাবার পা ধরে ছেলে করে ক্রন্দন
বলে, "যা শাস্তি দিলে
নেব আমি মাথা পেতে
যদি পাপ দূরে যায়।
তবে মুক্তির উপায়
অনুগ্রহ করে পিতা করুণ বর্ণন।
বশিষ্ট মুনির মনে বাৎসল্য জাগে
বলে, "কোনদিন যদি
শ্রীরাম করুণানিধি
দেখা দেন কৃপা করে,
একমাত্র সে প্রহরে
অভিশাপ শেষ হবে। মুক্তি নেই আগে।
পেয়েছি তোমার দেখা আজ ভাগ্যগুণে
প্রতিদিন রামনাম
মনে মনে জপতাম
কেঁদে কেঁদে ভাবতাম —
কবে দেখা পাবো রাম।"
রামের গলল প্রাণ বৃত্তান্ত শুনে।

বাবার নিকটে গিয়ে নম্র করপুটে
বলে ধীরে রঘুপতি
"দাও বাবা অনুমতি"
রাজা হবে, "তাই হোক",
নাম করো "সার্থক
পতিত জমিতে যাতে নানা ফুল ফোটে।"
রাম নিজে গুহকের বাঁধন খুললেন।
লক্ষ্মণকে বলে, "ভাই,
তোমার সাহায্য চাই।
আয়োজন করো সব,
এও এক উৎসব।"
লক্ষ্মণ হাসিমুখে তাই করলেন।
স্বর্গের দেবতারা দেখে স্বর্গ থেকে—
ব্রাক্ষ্মণ চন্ডালকে বুকে
জড়ালো পরম সুখে।

জুড়ালো তাদের চোখ,
ভাবলো এমনই হোক।
দুজনের বন্ধুত্ব হল অগ্নিসাক্ষী রেখে।
রাম বলে, "বন্ধু থাকো, এই আমি চাই।
যেই তুমি, সেই আমি;
বন্ধুতা সর্বত্রগামী।
নানা ভাষা-এক কথা।
অভিন্ন মানবিকতা।
ব্রাহ্মণ ও চন্ডালেতে কোন ভেদ নাই।
ভালো কথা, তবে সবিনয়ে জানতে চাই —
সত্যি কথা বলো রাম
ব্রাহ্মণ হয়েও তুমি
চন্ডালের হস্ত চুমি
পূর্ণ করলে মনস্কাম।
কেন ? এর পিছনে কি কোন ফন্দি নাই ?
একি শুদ্ধ জীবে প্রেম নাকি কোন ছল ?
যখনই শুনেছ তুমি
ভরতের মুখ থেকে
এ চন্ডাল পায়ে তির
ছোড়ে; ও লক্ষ্যে স্থির।
তখনই এ বিদ্যা শিখতে আঁটো নি কৌশল ?
বলো রাম, স্পষ্ট করে, রেখো না কুহক,
না থাকতো যদি এই
চন্ডালের এ দক্ষতা,জি
কিম্বা তোমারও যদি
থাকতো এ যোগ্যতা—
বন্ধুর সম্মান পেত কি গুহক ?
সেই সাথে তুমি বলো, রাজা দশরথ।
হঠাৎ আজব সুরে
অ্যাকশো আশি ডিগ্রী ঘুরে
কেন দিলে অনুমতি
বন্ধু করে নিতে তাকে —
যাকে মারতে ছুড়েছিলে শর "পাশুপত ?"
তুমিও কি বুঝেছিলে রামের মতলব ?
যা হোক, এ সংশয়
দূর করো দয়াময়।
ভন্ডামির হোক ক্ষয়
সত্যের হোক জয়।
একি ! কেন দুই জনে তোমরা নীরব ?

## হাসছে শরৎ

### বসুন্ধরা মাজি

হাসছে শরৎ পদ্মফুলে মিষ্টি সুবাস মেখে,
নদীর তীরে কে দিল আজ কাশের শোভা এঁকে ?
দেখছ কেমন শিউলি গাছে ভর্তি কুঁড়ির ঝুড়ি
বনটিয়ারা বলল – এবার আমরা তবে উড়ি।

গ্রাম ছাড়িয়ে মাঠ পেরিয়ে অনেক অনেক দূরে,
ভাসছে কেমন আলোর তরী আকাশখানা জুড়ে।
রোদ পড়েছে শিরিষডালে বৈঁচিঝোপের ফাঁকে,
অ্যাত্তো খুশি ছড়িয়ে গেল প্রজাপতির ঝাঁকে।

ছড়িয়ে গেল আনন্দটা ঘাসের বনে বনে —
আশ্বিনের এক মিষ্টি দিনে পুজোর আলিঙ্গনে।।

## কাণ্ডগুলো

### মৃত্যুঞ্জয় কুণ্ডু

দুপুরবেলা উপুড় হয়ে শুলেই নাকি ভূত ধরে।
মাদারপুরের দাদারা সব কেবল নাকি খুঁত ধরে।
বদ্যিপুরে সর্দি হলেই সক্কলে খায় থানকুনি
ভাগলপুরের ছাগলরা সব ঘাস খেতে যায় ডানকুনি।
আমতাতে সব নামতা পড়ে বসে ঘরের জানলাতে,
নুনের সাথে চুন গুলে দেয় টাটকা কপির ডালনাতে।
বাগবাজারে রাগ হলে সব ঘুমোয় ঘরে খিল দিয়ে,
কাব্য লেখে নাব্য করে চমকপ্রদ মিল দিয়ে ।
বর্ধমানে সবাই জানে আঁধার হলেই ঘুটঘুটি,
একলা বসে আঙুল চোষে কাণ্ডগুলো উদ্‌ভুটি।

## সেদিন রাতে
### বিকাশ পন্ডিত

সেদিন রাতে পান্তা ভাতে
শুটকি মাছের পোড়া,
কোমর কষে খাচ্ছে বসে
মস্ত জলঢোড়া।

দেখে হাসে সবুজ ঘাসে
ময়নাগড়ের টিয়ে,
কুসুমপুরে ভরদুপুরে
কালকে যা তার বিয়ে।

শুনেই হাসে জলে ভাসে
বোয়াল মাছের বউ,
বাজিয়ে বাঁশি ঢোলক কাঁসি
গান ধরেছে ফেউ।

## চাই কিছু অন্য
### শান্তিরঞ্জন চক্রবর্তী

করেছি তো ধ্বংস
বাবুদের ঘরে যত
ইঁদুরের বংশ।
মুখ মেরে গেছে তাই
চাই কিছু অন্য
হতে পারি বাঘমাসি
নই তো গো বন্য।
হুলোটার আব্দার
বানা পুসি নাস্তা
বাবুদের মত করে
চাউমিন পাস্তা।

## ফুটবল
### কাজী শাহাদাত আলী

ফুটবল ফুটবল
সারা মাঠ ছুটোছুটি
পায়ে পায়ে লুটোপুটি
থাকে সদা চঞ্চল
ফুটবল।
পেটে শুধু ভরা হাওয়া
রাতদিন লাথি খাওয়া
এই তবে রাশি ফল ?
ফুটবল।
যদি কোন ফাঁকতালে
তুমি গিয়ে পড়ো জালে
চেঁচামেচি কোলাহল
ফুটবল।
আনন্দ দাও জানি
দেখে দেখে দশা খানি
নয়নের ঝরে জল
ফুটবল।

## আঁকার গুতো
### সুভাষ মুখোপাধ্যায়

বললো একটা বাঘ
আমায় একটু আঁক
যেই এঁকেছি লেজ
বাড়িয়ে দিল নাক,

অমনি নাকের গুতো
করছিল খুতখুত ও
"ভালো করে আঁক না আমায়
আমি কি অচ্ছুত ও",

আঁকতে থাকি তাই
ভয়েতেই মরে যাই
থাকনা আমার আঁকার খাতা
দৌড়ে দূরে পালাই।।

## বর্ণ ভরা স্বর্ণ ঝরা
### অজয় বিশ্বাস

বক্ষ জুড়ে লক্ষ সুরে
মনটা করে জয়,
বুকের ভাষা সুখের আশা
"বর্ণপরিচয়।"

যত্ন করা রত্ন ভরা
নেই যে তার ক্ষয়,
হৃদয় মাঝে কেবল বাজে
"বর্ণপরিচয়।"

ভোরের পাখি দোরের আঁখি
সুরেই জেগে রয়,
বর্ণভরা স্বর্ণ ঝরা
"বর্ণপরিচয়।"

ফুটল কথা জুটল যথা
পুষ্প বর্ণময়,
মুছে কালো দেখায় আলো
"বর্ণপরিচয়।"

## বটুকবাবু
### নিখিলরঞ্জন চক্রবর্তী

বটুকবাবু গিয়েছিলেন
শ্বশুরবাড়ি চাতরাতে,
সেইখানেতে গিয়ে দেখেন
খায়না কেউই ভাত রাতে।
ভাতের ভক্ত বটুকবাবু
পেটের ব্যথায় হলেন কাবু।
মাইলো আটার রুটি খেয়ে
থাকেন কেবল কাতরাতে।

নিবন্ধ

মাদার টেরিজার জন্ম যুগোস্লাভিয়ার স্কোপিও শহরে। জন্মের পরদিনই তাঁর নাম দেওয়া হয়েছিল অ্যাগনেস গোনঝা। মা ডাকতেন অ্যাগিনে, দাদা বলতেন গোনঝা। নামের অর্থ ফুলের কুঁড়ি। তিনিই ফুল হয়ে ফুটে উঠলেন, হলেন মাদার টেরিজা।

# সন্ত হলেন মাদার টেরিজা

## শীলা সরকার

মৃত্যুর উনিশ বছর পর মাদার টেরিজা পেলেন "সন্ত" উপাধি। ২০১৬-র ৪ সেপ্টেম্বর মাদারকে সন্ত উপাধিতে ভূষিত করল রোমান ক্যাথলিক চার্চ। ঘোষণা করেছিলেন পোপ ফ্রান্সিস। সন্ত হওয়ার যে শর্ত আরোপ করা হয়েছিল তা পূর্ণ হতে সময় লাগলো মাদারের মৃত্যুর পর ১৯ বছর। কলকাতায় জীবন কেটেছে টেরিজার। সেই শর্তে তাঁর এই সন্ত উপাধি কলকাতার আর্চবিশপ টমাস ডিসুজা এই শহরেই চেয়েছিলেন। কিন্তু মাদার তো সারা পৃথিবীর মা। যে শর্ত আরোপ করা হয়েছিল, সেই শর্ত মাদারের মৃত্যুর পরে হলেও পূরণ করেছেন। তাঁর সার্থক জীবন উৎসর্গ করেছিলেন গরিব, দীন, দুঃখী অসহায় শিশুদের জন্য। এছাড়াও ছিল মানুষের সেবা। ঈশ্বরত্ব পেতে হলে ঈশ্বর যে গুণে গুণান্বিত বলে কথিত, সেই গুণগুলি যে মানুষের মধ্যেও বিদ্যমান থাকে, যাঁর কথা সত্য, সৎ জীবনযাপন করেন, এটাই ঈশ্বর সাধনার শ্রেষ্ঠ সাধনা। তাই রোমের অনুষ্ঠানে যোগ দেন মিশনারিজ অব চ্যারিটির সিস্টার প্রেমী। কলকাতার মাদার হাউসে মাদারের সমাধিস্থলের পাশে আয়োজিত হয়েছিল এক বিশেষ প্রার্থনা সভা। কলকাতার বিভিন্ন খ্রিষ্টান প্রতিষ্ঠান, মাদার হাউস একসাথে মিলে ২ অক্টোবর নেতাজী ইন্ডোর ষ্টেডিয়ামে থ্যাঙ্কস গিভিং অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। বহু মানুষের উপস্থিতিতে সেদিন নতুন ইতিহাসের সূচনা হবে।

১৯৮৯ সালে নোবেল পুরস্কার পান মাদার। ভ্যাটিকানের তরফে সন্ত হওয়ার স্বীকৃতি পেতে দুটি অলৌকিক ঘটনা ঘটার প্রয়োজন ছিল। ১৯৯৮ সালে মনিরা বেসরা নামে পশ্চিমবঙ্গের এক আদিবাসী মাদার টেরিজার নামে প্রার্থনা করেন তার পেটের টিউমার সেরে যাওয়ার জন্য। ২০০২ তে এই ঘটনাকে অলৌকিক বলে চিহ্নিত করে ভ্যাটিকান। দ্বিতীয় - অলৌকিক ঘটনা ২০০৩ সালের। তখন পোপ ছিলেন দ্বিতীয় জন পল। তিনি মাদারকে ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্যা বলে ঘোষণা করেন "বিয়েটিফিকেশন" অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এরপরের ঘটনা ২০০৮ সালের। এটি ছিল দ্বিতীয় ধাপ। ঐ বছর ব্রাজিলে মাদার টেরিজার নামে প্রার্থনা করে সুস্থ হয়ে ওঠেন ব্রাজিলেরই এক যুবক। মাথায় অনেকগুলি টিউমার ছিল যুবকটির। গত বছর ১৮ ডিসেম্বর পোপ মৃতপ্রায় ব্রাজীলীয় যুবকের সুস্থ হয়ে ওঠার ঘটনাকে দ্বিতীয় অলৌকিক ঘটনা হিসাবে স্বীকার করে নেন এবং তখনই মাদার টেরিজার সন্ত উপাধি পাওয়া নিশ্চিত হয়ে যায়। অপেক্ষা ছিল ভ্যাটিকানের তরফে তারিখ ঘোষণার। অবশেষে আমরা পেলাম সন্ত মাদারকে।

গত ৫ সেপ্টেম্বর ছিল মাদারের মৃত্যুদিন সেদিন মাদারের মৃত্যুর উনিশ বছর পূর্ণ হয়েছে। আর তার আগের দিনই এই পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা শহরের মা-কে সন্ত উপাধি দিল ভ্যাটিকান। স্বীকৃতি দিল সারা বিশ্ব। মায়ের কাছে আমাদেরও প্রার্থনা বিশ্বে শান্তি ফিরিয়ে আনো। তাঁর অবদানের বার্তা পৌঁছে যাক ঘরে ঘরে।

গল্প

# ভজবাবুর বন্ধু

## সৌম্যনারায়ণ আচার্য

কুয়ো তলায় গিয়েই সদর দরজার কাছে শব্দটা শুনতে পেলেন ভজবাবু। আর তারপরেই তাঁর বুকটা ছ্যাৎ করে উঠল। উনি বুঝতে পারলেন কী হতে যাচ্ছে। উনি সেখানে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে সোজা রান্নাঘরের দিকে ঢুকলেন। আর তারপরে করিডোর দিয়ে সোজা সদর দরজার দিকে যেতেই দেখলেন দুধের পাত্রটা কানায় কানায় ভর্তি অবস্থায় রাখা আছে। দরজাটাও ভেজানো। তার মানে আজও তাঁর এই অদৃশ্য পরোপকারী বন্ধুটি দরজা বন্ধ করে নি। উনি সোজা দরজাটা বন্ধ করে দুধের পাত্রটা বাঁ হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকে ডান হাত দিয়ে দরজাটা বন্ধ করে রান্নাঘরে এলেন। এর পর যদি দুধটা না গরম করেন তাহলে কী হবে সেটা উনি জানেন। না, দুধটা নষ্ট হয়ে যাবে না, ওটা উনুনের উপরে ফুটতে থাকবে আর উথলে পড়েও যেতে পারে। তবে পুরো ব্যাপারটাই হবে তাঁর অনুপস্থিতিতে।

তাই ভজবাবু সেটা গ্যাসের উনুনে চাপিয়ে টুলটাতে বসে ভাবতে লাগলেন গত এক মাসের কথা। গত এক বছর ধরে পুরুলিয়ার এই ছোট্ট শহরে বাস করছেন শ্রী ভজগোবিন্দ তরফদার। স্থানীয় একটা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উনি শিক্ষক। গত কয়েক মাস একটা অন্য বাড়িতে ভাড়া ছিলেন। তারপরে সহকর্মী অনাদিবাবুর পরামর্শে এই বাড়িটা ভাড়া নেন। বাড়িটার বর্তমান মালিক শ্রীধর ধর পাকা গোঁফের ফাঁকে মুচকি হেসে বলেছিলেন, এতো সস্থায় আপনি এই অঞ্চলে ভালো বাড়ি পাবেন না। বাড়িটার সবটাই ভালো, তবে...

তবে কী সেটা হাজার অনুরোধেও বললেন না ধরবাবু। বললেন, আপনি এখানে আরামে থাকতে পারবেন। বর্তমানে ওঁরা ছেলের কাছে পুরুলিয়াতে থাকেন। প্রথম প্রথম তেমন কিছুই হয়নি। তারপরে গত মাস থেকে হঠাৎ নানান রকম ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে। একদিন রবিবার সকালে হঠাৎ ঠিক ছ'টার সময় তাঁর মনে হল, রান্নাঘরে কিছু একটা হচ্ছে। ঢুকে দেখেন, বাতি জ্বলছে আর উনুনে চায়ের জল ফুটছে। শুধু তাই নয়, দুধের বাসনটাও পাশেই রাখা আছে। অর্থাৎ কেউ তাঁর অনুপস্থিতিতে এটা করেছে। ওঁর বুক ধুকধক করতে লাগল। শীতেও ঘামতে থাকলেন উনি। তারপরে দুপুরে বাইরে একটা শব্দ শুনে বুঝতে পারলেন, খবরের কাগজটা দিয়েছে। ভাবলেন, পরে গিয়ে আনবেন। এখন রান্নাঘরে গিয়ে বাকী কাজটা করা যাক। রান্নাঘর থেকে ফিরে এসে দেখলেন কাগজটা টেবিলে রাখা আছে। আর করিডোরের দরজাটা খোলা। মানে, যিনি ওটা এনেছেন, উনি দরজাটা বন্ধ করেন নি। রাত্রিবেলায়, ওঁর একটু ঠান্ডা লাগতে লাগল। বুঝতে পারলেন, লেপের সাথে একটা কম্বল চাপাতে হবে। কিন্তু সেটা করতে হলে ওঁকে বিছানা ছেড়ে উঠে নিতে হবে। কিন্তু কেন জানিনা, ওঁকে এক ধরণের আলসেমিতে পেয়ে বসল। উনি ভাবলেন, উঠবেন না। একবার ঘুম এসে গেলে আর ঠান্ডা লাগবে না। একটু ঘুমিয়ে পড়েও ছিলেন, কিন্তু তাঁর মনে হল, কে যেন গায়ে কম্বলটা চাপিয়ে দিয়েছে। ঘুমতো মাথায় উঠল। বাকী রাতটা ঠাকুর নাম করেই কাটল।

পরের দিন রবিবার ভাবলেন বাগানে গিয়ে আগাছাগুলোকে উপড়ে দেবেন। সকালের জলখাবারটা খেয়ে বাগানে পৌঁছে দেখেন, দেয়ালের আগাছা একটু বেড়ে গেছে। কিন্তু খুরপিটা আনতে ভুলে গেছেন। যাই হোক, আগে সেদিকে গিয়ে দেখা যাক। দেয়ালের কাছে গিয়ে দেখলেন, আগাছার মধ্যে একটা লাল কুমড়োর গাছ হয়েছে। তারপরে যেই

উলটো মুখে দাঁড়ালেন। দেখলেন কলা গাছটার কাছেই খুরপিটা রাখা আছে। এখন আর চমকান না ভজবাবু। বুঝতে পারলেন কেউ একজন আছে যে খুব পরোপকারী আর অদৃশ্য। কিন্তু সে যদি তার চেহারাটা দেখায়, তাহলে কী হবে। উনি কি ভয় পেয়ে যাবেনা না ?

বিকেলে সপরিবারে বাড়িতে এলেন সদানন্দবাবু। হাতে তাঁর বাড়ির মর্তমান কলা। তা দেখে ভজবাবু তো অবাক। আরে, বেশ পেকেছে মনে হচ্ছে ?

শুনে সদানন্দবাবু বললেন, আপনিই তো সকালে আমার বাড়ি গিয়ে বললেন, পাকলে আমাকে কিছু দেবেন। তাই গিন্নি বললেন, পেকে তো গেছে। ভজবাবুকে দিয়ে এসো।

শুনে উনি আর কিছু মন্তব্য করলেন না। বুঝতে পারলেন, তাঁর সেই অদৃশ্য বন্ধু এই কাজটা করেছে। অবশ্য এটার কোনো দরকার ছিল না। তাঁর বাড়িতেও গাছে কলা ধরেছে। দাঁড়ান, চা আনছি। বলে রান্না ঘরে গিয়ে দেখলেন, সেখানে চা তৈরি।

সন্ধ্যেবেলায় এলেন মুখার্জীবাবু। প্রথমে ভেবেছিলেন, দরজাটা খুলবেন না। কারণ, গত সপ্তাহে তাঁর মেয়ের জন্মদিনে তাঁকে নেমন্তন্ন করেছিলেন তিনি। আর ভাজবাবু যাননি। এই শীতের রাতে কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। ভেবেছিলেন বলবেন, শরীর খারাপ ছিল। যাই হোক, দরজা খুলে দেখলেন, মুখার্জীবাবুর হাতে তাঁর সেই উলের টুপি। অবাক হয়ে বললেন, এটা আপনার কাছে এলো কী করে ?

আপনি আমার মেয়ের জন্মদিনে যখন গিয়েছিলেন, তখন এটা খুলে টেবিলে রেখে দিয়েছিলেন। তারপরে ভুলে গিয়েছিলেন। শুনে অবাক হবার পালা তাঁর। কিন্তু কিছু করার নেই। ব্যাপারটা তাঁর আয়ত্তে নেই। মুখার্জীবাবু সুন্দর খেলনা উপহার দেওয়ার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানালেন। উনি চলে যাবার পরে আলমারি খুলে দেখেন, সত্যিই টুপিটা সেখানে নেই।

পরের দিন গ্রামের বাড়িতে গিয়ে ফিরতে দেরি হয়ে গেল। সদর রাস্তা ছেড়ে নিজের বাড়ির রাস্তা ধরতেই দুটো লোক দু'দিক থেকে তাঁকে ঘিরে ধরল। দু'জনের হাতে ধারালো ছুরি। একজন বলল, সব দিয়ে দাও। ভজবাবু বললেন, আমার কাছে সামান্য কিছু টাকা আছে। অন্য লোকটা বলল, আর হাতের এই আংটিটা। এটাও দিতে হবে।

আংটিটা ভজবাবু আঙুল থেকে খুলতে যাবেন অমনি কে যেন তাঁর ডানদিকের লোকটাকে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিল। দ্বিতীয় লোকটা হাতের ছুরিটা বাগিয়ে ধরতে না ধরতেই কাটা শালগাছের মত মাটিতে পড়ে গেল। ভজবাবু কাউকে দেখতে পেলেন না।

বাড়িতে ফিরে এসে ভজবাবু ভাবতে লাগলেন। যেই তাঁর এই ভাড়াবাড়িতে থাকুক, তিনি ভয় পাবেন না। কারণ, সে তো তাঁর বন্ধু। সে তাঁর উপকারই করে আসছে, তাই না ?

---

## সব পেয়েছির দেশ

**সুজিতকুমার পাত্র**

ইচ্ছে ঘোড়ার সওয়ার হয়ে ছুটবো তেপান্তরে
সাতটি সাগর পেরিয়ে যাবো যাদুর ছুঃমন্তরে।

সেই যেখানে রূপকথাপুর ব্যাঙ্গমাদের বাস
আমার সাথে সেই মুলুকে কেউ কি যেতে চাস ?

সেই দেশেতে দুঃখ কোথায় শুধুই খুশির রেশ
চাইলে পরে সব পাওয়া যায় সব পেয়েছির দেশ।

সেই দেশে নাই পড়াশোনা নাইতো কেরিয়ার
চাইলে যেতে আয়না ছুটে কিসের দেরি আর ?


সঞ্চিতা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত

অমিয়কুমার সেনগুপ্তের

ছোটদের জন্য ছ'টি মনমাতানো ছড়াগ্রন্থ

মিষ্টি রোদের বিষ্টিতে
সবুজের মেলা
হইচই
এই ছেলেটি
আমরা সবাই বন্ধু হব
নীল আকাশে মেঘের দেশে

## সার্থকতা

### শীলা মুখোপাধ্যায়

ছোট্ট ছেলে থাকত মফঃস্বলে
পড়তো সে এক গ্রামেরই ইস্কুলে।
ছোট্ট পায়ে চলতে চলতে এল কিশোর বেলা।
মনের মধ্যে ইচ্ছে যতেক করতে থাকে খেলা।
দুচোখ জোড়া স্বপ্ন যে তার কত।
বড় মানুষ হবে সেও.... সেই কিশোর ভাবত।
আরো অনেক এগিয়ে যাবে পড়াশুনো করে,
এগিয়ে গেছেন গুরুজনে... চলবে সে পথ ধরে।
তবু, এর বেশি যে হবে না এ মফঃস্বলে থেকে,
যেতেই হবে শহরে এই মফঃস্বলকে রেখে।
পড়াশোনার দ্বিতীয় দফায় পৌঁছে গেল শেষে
হাজার বাতির মস্ত শহর আত্মীয়দের দেশে।
ভেবেছিল নিকট জলে আপন করেই নেবে
তার জীবনে এগিয়ে চলার সুযোগ করে দেবে।
এ যে সব মিথ্যে আশা, বুঝল কিছু দিনেই।
ভারী কঠিন সময় তখন প্রতি ক্ষণে ক্ষণেই।
কেউ নেবে না আপন করে, বুঝেই গেল নিজে
বাইরে থেকে আসা সে তো... করবে এবার কী যে।
বুঝেই সে যে দাঁড়াল তার আপন পায়ের ভরে,
সংগ্রামের এক শহর চেনায় রোদ বৃষ্টি ঝড়ে।
পায়ে পায়ে এগিয়ে চলে, একলা চলার পথ,
জোর কদমে ছুটতে থাকে জীবন-যুদ্ধ রথ।
সেদিনের সেই কিশোর বালক আজকে পরিণত,
ভাগ্যদাতার আশীর্বাদে নেই কো ইতস্ততঃ।

## বাজারেতে

### কাজল দাস

বাজারেতে কত লোক লম্বা পাতলা বেঁটে,
কেউ আসে গাড়ি চড়ে, কেই আসে হেঁটে।
কারো হাত খালি থাকে, কারো হাতে থলি
বাজার সেরে বলে "দাদা আজ তবে চলি"
কেউ কেনে মাছ-ডিম-মাংস-কাঁচা সবজি
ঘরে বসে সুখে খাবে ডুবিয়ে নুলো কবজি।
এইভাবে বিকিকিনি, কেউ দর কষে,
একটি ছেলে ভিক্ষে করে এককোণে বসে।

## জাতসাপদের খেলা

### প্রদীপকুমার রায়

সাপেরা সব থাকবে কোথায়
ছাড়া - ভিটেয় ছাড়া ?
চিরটাকাল তাই সেখানে
সাপের যে পাই সাড়া।
কেউ বা বলে গোখরো না হয়
কেউটে হবে ওটা,
কেউ বলে যে বিষাক্ত সাপ
কালনাগিনী ওটা।
ছোবল মেরে কোন ভাবে
বিষ যদি সে ঢালে,
ওঝা বলবে, — বাঁচবে না আর
ঠিক খেয়েছে কালে।
আগের কালে সব বিপদে
ডাকতো লোকে ওঝা,
অস্ত্র তাদের, শুধুই মুখে
ছু'মন্তর গোঁজা।
আজকাল তো প্রতিষেধক
ইঞ্জেকশন আছে,
সাপের বিষও হার মেনে যায়
সেই মন্ত্রের কাছে।
এখন ওঝার জারিজুরি
ঢ্যামনা সাপের বেলা,
বিষ না পেলে কে দেখাবে
জাতসাপেদের খেলা ?

## যাচ্ছো কোথায়

### তপনকুমার দাস

যাচ্ছো কোথায় উলটোডাঙায়,
কী নাম তোমার ? সতীশ কুমার।
কোথায় থাকো ? জোড়া সাঁকো।
বাবার নাম কেলে সুদাম
মাথায় কী ও – হলুদ গুঁড়ো।

খেলা

# অলিম্পিক, জেসি ওয়েন্স ও হিটলার

## অমল ত্রিবেদী

গত আগস্ট মাসে ব্রাজিলের রিও তে হয়ে গেল অলিম্পিক গেমস। এ নিয়ে সারা বিশ্বের সমস্ত ক্রীড়াপ্রেমী ১৬ দিন ধরে রুদ্বশ্বাস প্রহর গুনেছেন। অলিম্পিকে কী হয়, কী হয়! আজ রিও ডি জেনিরো গেমস নয়, আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি ৯০ বছর। ১৯৩৬ এর বার্লিন অলিম্পিক্স। যে অলিম্পিক জেসি ওয়েন্স, ধ্যানচাঁদ ও জার্মানির কুখ্যাত শাসক হের হিটলারের জন্য স্মরণীয় হয়ে আছে।

প্রথমেই বার্লিনকে একাদশ অলিম্পিকের দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয় ১৯৩২ লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে। জার্মানির শাসক অ্যাডলফ্ হিটলার শ্বেতাঙ্গ কর্মকর্তাদের ওপর নিজের প্রভাব বিস্তার করে এই গেমস প্রথমবার জার্মানিতে নিয়ে এলেন। গেমস বয়কটের জন্য বিশ্বের নানা দেশ আন্দোলন শুরু করে দেয়। ১৯৩৩ এ জার্মানির চ্যান্সেলর নিযুক্ত করা হল হিটলারকে। অর্থাৎ তিনিই দেশের সর্বেসর্বা। এরপর বিশ্বজুড়ে শুরু হল ইহুদি নিধন। ফ্যাসিস্ত জার্মানিতে অনেক দেশ না যাওয়ার সিদ্ধান্তে অটল হয়ে রইল। কিন্তু সময় না থাকায় প্রতিযোগিতাকে অন্য দেশে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হলনা। নানা উত্থান পতনের পর অলিম্পিক বার্লিনেই শুরু হল ১ আগস্ট ১৯৩৬। ৪৯ টি দেশের ৪০৬৬ জন খেলোয়াড় সহ এক লক্ষ দশ হাজার দর্শকের সামনে হিটলার অনেকক্ষণ কথা বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আই ও সি -র

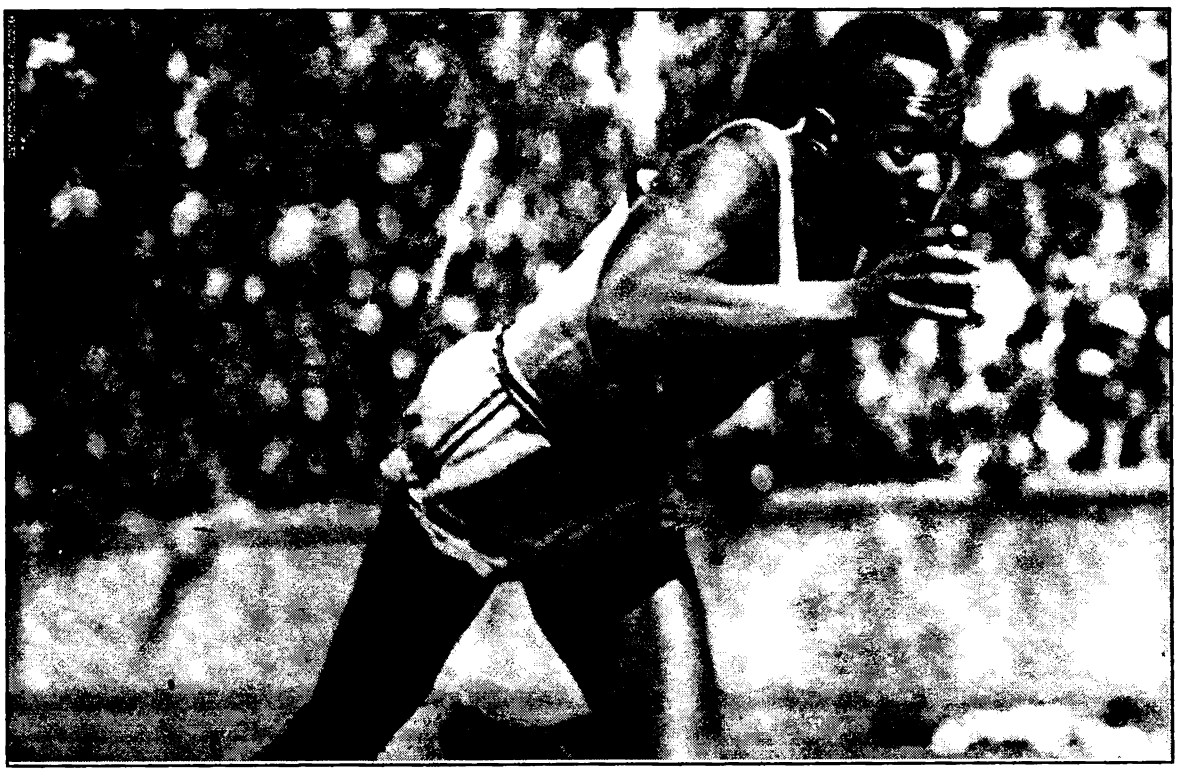

নিয়ম অনুযায়ী তিনি শুথু বললেন— আমি একাদশ অলিম্পিক গেমসের উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

হিটলার ভয়ানক কৃষ্ণাঙ্গ বিদ্বেষী ছিলেন। এ তো সবার জানা। এই হিটলার বার্লিনে যা করেছিলেন, তার জন্য আজও শ্বেতাঙ্গরা লজ্জা পান। তাঁর নাকে ঝামা ঘষে দেন, আমেরিকান কৃষ্ণাঙ্গ অ্যাথলিট জেসি ওয়েন্স। জেসি হিটলারের গর্ব ধূলিসাৎ করে দেন। অলিম্পিক গেমস যতদিন এগিয়ে চলে ততই হিটলারের রাতের ঘুম চলে যেতে থাকে। জার্মানি ও তার প্রশাসকের কাছে অন্ধকার দিন হয়ে দেখা দিতে লাগল গেমস। যুক্তরাষ্ট্রের ওহিও বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষ্ণবর্ণ স্প্রিন্টার ওয়েন্স এই অলিম্পিকে বিশ্বের সেরা অ্যাথলিট নির্বাচিত হলেন। হিটলারের কাছে যা চরম লজ্জার ও অপমানের। এক কালো চামড়ার মানুষ সাদা চামড়ার মানুষদের খেলায় হারিয়ে দিয়ে সোনা জিতে নেবে এ তাঁর কল্পনার অতীত। শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণাঙ্গ অ্যাথলিটদের জয়জয়কার ঘোষিত হল জর্মানিতে। ওয়েন্স ১০০ মিটার দৌড়, ২০০ মিটার দৌড় ও ৪০০ মিটার রিলে দৌড়ে পরপর তিনটি সোনার পদক জিতে নিলেন। ১০০ মিটারে প্রথম হতে তাঁর সময় লাগল ১০.৩ সেকেন্ড ও ২০০ মিটারে সময় লাগে ২০.৭ সেকেন্ড। হিটে জেসি ১০.২ সেকেন্ডে ১০০ মিটার দৌড়লে শ্বেতাঙ্গরা চেঁচিয়ে ওঠেন হাওয়ার অনুকুলে সিন্ডার কোর্টে দৌড়েছেন জেসি। ফলে এই রেকর্ড বাতিল করে দেয় আই ও সি। তাও হিটলারের কাছে এটা অপমানের। কত বড় স্পর্ধা একজন নিগ্রোর। ১০০ মিঃ দৌড়ে ফাইনালে ছুটলেন রালফ মেটকাফে। তিওি কালো। ৮০০ মিটারে দৌড় লেন জন উডরাফ, চার্লস হর্নবস্টেল ও হ্যারি উইলিয়মসন। সবাই নিগ্রো অর্থাৎ রেড ইন্ডিয়ান। হিটলারের কাছে এসব মুখ কালো হওয়ার বিষয়। হাইজাম্পে প্রথম তিনজন আমেরিকার। সবাই কৃষ্ণাঙ্গ। সোনা পাওয়া কর্নেলিয়াস ২.০৩ মিটার লাফিয়ে আবার অলিম্পিক রেকর্ড করেছেন। এতক্ষণ এসব চোখের সামনে দেখে মাঠে উপস্থিত হের হিটলার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ও মাঠ ছেড়ে চলে গেলেন। তারই সারাদিনের পুরস্কার দেবার কথা। হঠাৎ তিনি পদক না দিয়ে চলে যাওয়ায় সবাই বিস্মিত। জানা গেল, কৃষ্ণাঙ্গদের গলায় সোনা, রুপোর পদক দিয়ে, হাতে ফুলের স্তবক দিয়ে হাত মেলানো এসব কিছুই করতে চাননি হিটলার। তাই অপমানিত হয়ে তিনি মাঠ থেকেই চলে যান। চলে গেলেও একেবারে বেরিয়ে যাননি। স্টেডিয়ামের নীচে গোপন কক্ষে তিনি বিশ্রামে যান। যে সকল শ্বেতাঙ্গ জার্মান অ্যাথলিট পুরস্কার পান তাদের পরে ঐ কক্ষে এনে হিটলারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। হিটলার প্রত্যেককে উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়ে তবে মাঠ ছাড়েন। ১০০ মিটার ও ২০০ মিটার দৌড়ে জেসি ওয়েন্স দু-দুটি বিশ্ব রেকর্ড গড়েন। এবার লং জাম্প (তখন ব্রড জাম্প বলা হত)। জার্মানির লুজ লং-এর সঙ্গে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর ওয়েন্স আবার সোনা পেলেন। লুজ রুপো। এই লুজ লংকে হিটলার অভিনন্দন বার্তা পাঠালেও জেসির ভাগ্যে তা জোটেনি। অথচ লুজ জেসিকে সবার আগে অভিনন্দন জানান। তাঁকে জড়িয়ে ধরে বলেন, "না তোমার সঙ্গে পারা যাবে না। আমার সব কাপ মেডেল তুমি গলিয়ে দেবে দেখছি।" ওয়েন্স দীর্ঘদিন ওঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখেন। চিঠিপত্রও দিতেন। লং যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যান ১৯৪০ সালের ১৪ জুলাই। জেসি তারপরেও লং পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন।

ওয়েন্স তৃতীয় সোনা জিতে নাকি হিটলারের সঙ্গে করমর্দন করতে গিয়েছিলেন। হিটলার রাজি হননি কালো অ্যাথলিষ্টের সঙ্গে হাত মেলাতে। অথচ দ্বিতীয় ও তৃতীয় হওয়া জার্মান ও ফিন প্রতিযোগীদের কে তিনি চেয়ারের সামনে ডেকে পাঠিয়ে করমর্দন করেন।

যুক্তরাষ্ট্র ৪x১০০ মিঃ দৌড়ে বিশ্বরেকর্ড করল। আবার দলে সেই ওয়েন্স। সাম স্টোলারের বদলে শেষ সময়ে দলে ঢোকেন জেসি। চতুর্থ সোনা জিতে জেসি ওয়েন্স হলেন অলিম্পিকের সেরা খেলোয়াড়। সারা বিশ্বের সবাই যখন তাঁকে নিয়ে উৎসাহী, অভিনন্দনের বন্যা বয়ে যেতে লাগল সর্বত্র, তখন হিটলার জেসিকে নিয়ে বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখাননি। সমস্ত কৃষ্ণাঙ্গ খেলোয়াড়ই ছিল তাঁর কাছে ব্রাত্য।

এ তো গেল হের হিটলারের কথা। কিন্তু জেসির নিজের দেশ ? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কী করল ? জেসির এই অভূতপূর্ব সাফল্যে বিশ্বের অনেক শ্বেতাঙ্গ দেশের প্রধানরা কোন সম্মান জানান নি। আর তার পুরোধা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডেলানো রুজভেল্টও। নিউইয়র্ক ও ক্লিভল্যান্ডে জেসির সম্মানে টিকার ডেপ প্যারেড হয়েছে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট জেসিকে হোয়াইট হাউসে ডেকে সম্মান জানাতে ভুলে যান। কোন অভিনন্দন বার্তাও পাঠাননি এই কৃষ্ণাঙ্গ অ্যাথলিটকে। তাঁকে আরও বেশি অসম্মান করে তাঁর দেশের অ্যামেচার অ্যাথলেটিক ইউনিয়ন। সামান্য কারণে তারা ওয়েন্সকে সাসপেন্ড করে দেয়। ইউনিয়ন প্রতি বছর দেশের সেরা অ্যাথলিটকে সুলিভান অ্যাওয়ার্ড দেয়। ১৯৩৫ এ জেসি বিশ্বরেকর্ড করেন। অথচ সুলিভান পান গলফ খেলোয়াড লসন লিটন। ১৯৩৬ এ অলিম্পিক গেমসে চারটি সোনা জয়ী জেসির বদলে সুলিভান অ্যাওয়ার্ড পেলেন ডেকাথলন চ্যাম্পিয়ন গ্লেন মরিস। শুধু কৃষ্ণাঙ্গ বলেই বঞ্চিত রয়ে গেলেন ওয়েন্স।

## গোবরে পদ্মফুল

**নীতীশ চৌধুরী**

লিখতে গেছি ব্যাকরণের
সেমিকোলন, কমা,
স্যার বললেন - গণশা মাথার
গোবর আগে কমা।
থাকলে মাথায় গোবর পোরা
সন্ধি-কারক-সমাস
শিখতে গেলে লাগবে রে তোর
নিদেনপক্ষে ছ'মাস।
বুঝি না হায় বসবে কোথায়
দাঁড়ি-ফুলইষ্টপ,
তাই তো আমি গোবরগণেশ,
বুদ্ধু, ফুলিশ টপ।
হয়না কিছুই আমার শেখা,
তাই তো উদাস থাকি,
মাথার ভেতর ডেকে ওঠে
হঠাৎ ছড়ার পাখি।
পাখির ভাষা লিখি খাতায়
হাজার ভুলে ভরা,
স্যার বললেন — গণশারে তুই
বেশ তো লিখিস ছড়া।
তাকাস নে আর পেছন ফিরে,
হোক না কিছু ভুল,
গোবর মাটির বুকেও ফোটে
অমল পদ্মফুল।

## নেতাজী স্মরণে

**মহাবীর নন্দী**

জানকীর পুত্র তবে নহ লবকুশ,
ভারতমাতার ছেলে তাদেরই মানুষ।
কদম কদম তালে দিল্লি চলো গান,
স্বাধীন ভারত দিল বাঁচার সম্মান।
দেশকাল সমাজের উর্ধে রহি — আজি,
অন্তরের শ্রদ্ধা লহ, হে বীর নেতাজী।

## করছে খেলা

**লালমোহন ভট্টাচার্য**

কার্টুন কার্টুন করছে খেলা আগডুমে বাগডুমে
দিনের বেলায় বুড়োরা সব স্বপ্ন দেখে ঘুমে।
কার্টুন কার্টুন করছে খেলা বিড়াল-ইঁদুর গুলো,
ডাঙার উপর কুমির উঠে মাখছে গায়ে ধুলো।
কার্টুন কার্টুন করছে খেলা কাক ও শেয়াল মিলে,
অজগরটা মুখ বাড়িয়ে পাহাড়টা খায় গিলে।
কার্টুন কার্টুন করছে খেলা টিয়া-ময়নার ছানা,
ধরতে এদের পারবে না আর পোষ মানানো মানা।

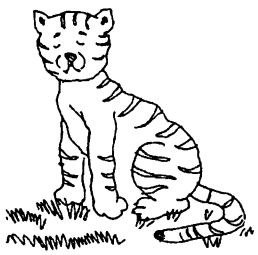

## স্বপ্ন

**তরুণ বাউরি**

সূর্য এখন ঘুমের দেশে চাঁদ উঠেছে ওই,
ঘুম পাড়ানি গান শোনাতে ঠান-দিদি আজ কই ?
রাজপুত্তুর ঘোড়ায় চেপে যাচ্ছে রণে কই ?
ঢাল তলোয়ার নিয়ে সেপাই করছে না হই চই।
হল্লারাজের শিখর চূড়ে ভূতগুলো আজ কই ?
ভুতুং মামা আসবে বলে পথ চেয়ে যে রই।
মাথার ভেতর স্বপ্ন-পোকা করছে মা থই থই,
থামবে কখন সেই পোকারা করবে না হই হই ?

## ধামসা সুরে বিশ্ব নাচে

**দীনেশচন্দ্র আচার্য**

ফুলের বনে ঘুরছে পাখি উড়ছে কত মৌমাছি,
তাইরে দেখে মিষ্টি খুকি নৃত্য করে ছৌ-নাচি।
করে গণেশ বন্দনা, নামটি যে তার চন্দনা,
অবাক চোখে দেখছে লোকে বলছে এসব মন্দনা।
তাইরে খোকার ধামসা বাজে মাদল বাজে ধিতাং-তাং,
ধামসা সুরে বিশ্ব নাচে বইছে খুশির জোয়ার-গাং।
নৃত্য তালে অঙ্গ দোলে দিচ্ছে সুরে চিৎপটাং,
উঠছে ফুটে জগত লুটে পুরুলিয়ার ধিতাং-তাং।

## মা আসছেন
### বদ্রীনাথ পাল

শঙ্খ বাজাও, আলপনা দাও, মঙ্গলঘট দ্বারে,
মঙ্গল ধুন উঠুক বেজে একতারাটির তারে।
মা আসছেন বছর পরে এই ধরার-ই বুকে,
হাসি খুশির বান ডেকেছে জগৎবাসীর মুখে।
আনন্দেতে শিউলিরা সব বসায় মিলন মেলা,
নীল আকাশে হাওয়ায় ভাসে সাদা মেঘের ভেলা।
নদীর বুকে ঢেউয়ের নাচন উথাল-পাথাল রবে
দুলিয়ে মাথা কাশ ফুলেরা তাল দিচ্ছে সবে।
শিশির কণা হাসছে যে ওই সবুজ ঘাসের পরে,
চাঁদনী রাতে জোছ্না কিরণ পড়ছে ঝরে ঝরে।
পদ্ম, শালুক তাকিয়ে আছে মায়ের চরণ আশে,
আগমনির সুর জেগেছে আকাশে-বাতাসে।
ঢ্যাং-কুড়া-কুড় বাজনা বাজে মন্দির চত্বরে,
মা আসছেন, বিশ্ব ভূবন সাজলো নতুন করে।

## পুজোর পরে
### জগদীশ মণ্ডল

ইস্কুল ছুটি, টুপুর মন খেলতে ছুটে যায়,
মা কিন্তু পড়তে বসায় নানান আছিলায়।
উদাসী মন থাকবে কেন বদ্ধ অন্ধকারে।
রেল লাইনে কাশের দোলা ডাকছে বারে বারে।
বাবা বলে, তোমার মতো আমার ছোটবেলা,
বেলুন হাতে, ভেঁপু বাঁশি, কাটতো সারা বেলা।
সেসব নেই, এখন খেলো ব্যাট - বলটি নিয়ে,
ছুটির শেষে পড়তে যাবে ব্যাগটি পীঠে দিয়ে।

## দুর্গাপূজা
### উদয়ন হাজরা

দুর্গাপূজা দুর্গাপূজা, অনেক খুশি অনেক মজা।
আকাশখানা নীলে ভরা, বলতো রং ছড়ায় কারা ?
কাশের বন নাড়ায় মাথা, গাছে গাছে সবুজ পাতা।
গাছে গাছে গাইছে পাখি, হাঁসের দল উঠছে ডাকি।
প্রকৃতি সেজেছে কী সুন্দর, মা আসছেন প্রণাম কর।

## আকাশ
### অঙ্কিতা আচার্য

এ আকাশ বড়ই মিষ্টি,
কখনো ঝরায় দেখো,
অঝোর ধারায় বিষ্টি।

এ আকাশ বড়ই ভালো,
কখনো ঘন নীল
আর কখনো বা কালো।

এ আকাশ রং ঢালে,
আমাদের জানালায়
ঘুমভাঙা সক্কালে !

## কবি লেখেন
### সতীরঞ্জন আদক

চাঁদ পাঠালো আলোর ধারা
উঠলো জেগে নিঝুম পাড়া
হাওয়ায় দোলে শুভ্রকাশ
রাতটা জুড়ে কি উচ্ছ্বাস।

জানলা খোলা তাকাই দূরে
মনটা ছোটে অচিনপুরে
সুবাস আনে হাসনুহানা
ডাকছে পাখি নাম না জানা।

দিঘির ধারে নদীর চরে
ভয়রা হেসে নৃত্য করে
চাঁদের বুড়ি চরকা কাটে
যায় না হেঁটে মেঘের ঘাটে।

নেইকো মেঘ আকাশ নীল
ঝিলিক মারে খাল ও বিল
এসব ছবি আমোদ করা
কবি লেখেন ছন্দে ছড়া।

## আয়ারল্যান্ডের লোককথা

অনেক অ-নে-ক বছর আগের কথা। সেসময় আয়ারল্যান্ডের আইরিকা নামে একটা গ্রাম ছিল। সেই গ্রামে এক গরিব চাষি বাস করত। তার নাম ছিল মাইক পারসেল। মাইক খুব গরিব ছিল। এমন গরিব যে তার ঘরবাড়ি, জমিজমা বলে কিছু ছিল না। কিন্তু চোখে ছিল তার বড় স্বপ্ন। একদিন সে খুব বড়লোক হবে। তার কাছে অনেক লোকজন কাজ করবে। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার জন্য বিঘে পাঁচেক জমি সে ভাগচাষে নিল। শুধু তাই নয়, জমিজমা চাষাবাদের জন্য সে কয়েকটা বলদ ও গাই নিল। তারপর স্বামী স্ত্রী মিলে খুব পরিশ্রম করে চাষাবাদ করল। কিন্তু কপাল তার খারাপ। আশানুরূপ ফসল সে বছর ফলল না। অবস্থাটা এমন দাঁড়াল বাড়ি ভাড়ার টাকা মেটাবার সঙ্গতি হল না তার। উপায়ন্তর না দেখে একটার পর একটা বলদ তাকে বেচতে হল। সেই টাকা দিয়ে কিছুটা দেনা মেটাতে লাগল। কিন্তু অভাব পিছু ছাড়ল না তাদর।

গরু বলদ বেচতে বেচতে সব শেষ হয়ে গেল। কেবলমাত্র একটা বলদ তখনো অবশিষ্ট ছিল। মাইকের স্ত্রী মলি বলল এই বলদটা শহরে নিয়ে গিয়ে বেচে দাও তাহলে ভালো দাম পাওয়া যাবে।

মাইকের সেটা পছন্দ নয়। এক এক করে সব বলদ তো বেচে দিয়েছে, এটা কী না বেচলে নয়। মনের মধ্যে কিন্তু থাকলেও অন্য কিছু উপায় ছিল না তাদের সামনে। তাই পরদিন সকালে বলদটাকে নিয়ে বার হল মাইক। যাবার সময় মলিকে বলল, যতটা সম্ভব বেশি দাম পাওয়া যায় তার চেষ্ট করব আমি।

মলির মুখে ম্লান হাসি। মনে সন্দেহ। মাইক আদৌ শহরে যাবে কিনা সে ব্যাপারে সন্দিহান ছিল তার মন। তবুও মুখে সে কিছু বলল না। মাইক বের হয়ে পড়ল শহরের উদ্দেশ্যে।

তাদের বাড়ি থেকে কর্ক শহর ছিল অে র। হাঁটত হাঁটতে পা দুটোতে ব্যথা ধরে গেল। কিন্তু কোথাও কোন যুতসই জায়গা পেল না বসার জন্য। হাঁটতে হাঁটতে সে পাহাড়ের কাছে চলে এল। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে উঠল। ক্ষুধায় পেট টনটন করতে থাকল। মাথাটা তার বন বন করে ঘুরতে শুরু করল। চোখে অন্ধকার দেখার আগেই সে দেখতে পেল টিলার ওপার থেকে কে যেন একজন আসছে। ওর কাছে জল পানি কিছু থাকলেও থাকতে পারে। এ কথা ভেবে মাইক তার বলদটাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে

# যাদু বোতল

## সৈয়দ রেজাউল করিম

পড়ল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মাইকের সামনে এসে হাজির হল একটা খর্বকায় লোক। অদ্ভুত তার চোখ মুখ গায়ের রং। পরনে কালো কোট। মুখমন্ডল হলদে। কুঞ্চিত কপাল। চোখ দুটো জবা ফুলের মত লাল। অদ্ভুত তার চলার ধরন। পা দুটো ব্যবহার না করে হড়কে চলায় সে বেশি স্বচ্ছন্দ। সে মাথা ঝুঁকিয়ে শুভেচ্ছা জানাল। অগত্যা মাইককেও শুভেচ্ছা জানাতে হল। কিন্তু তাকে এড়িয়ে যেতে দ্রুত পদে সে পা চালাল শহরের দিকে।

ব্যাপারটা উপলব্ধি করে খর্বকায় লোকটি তাকে অনুসরণ করল। পথে যেতে যেতে সে শুধাল — বলদটা নিয়ে কোথায় চলেছ বন্ধু।

কথাগুলো তার কাটা কাটা। সুমধুর নয়। তবুও বুঝতে অসুবিধে হল না মাইকের। সে জবাব দিল — শহরে যাচ্ছি বলটাকে বেচতে।

খর্বকায় লোকটা বলল — চাইলে বলদটা আমার কাছে বেচতে পারো।

লোকটার অবস্থা বুঝে মনে মনে হাসল মাইক। তবুও জিজ্ঞেস করল - কত দাম দেবে ?

লোকটা তার কোটের পকেটে হাত ঢোকাল। সেখান থেকে একটা বোতল বার করল। সেটা দেখিয়ে সে বলল , আমার কাছে টাকা পয়সা নেই। তবে এই বলদটার বদলে আমার এই বোতলটা তোমাকে দিতে পারি।

লোকটার কথা শুনে হাসি চেপে রাখতে পারল না মাইক। হো হো করে সে হেসে উঠল। সে বলল, বলদের বদলে বোতল ?

লোকটা বেশ আত্মনির্ভরতার সাথে বলল - হাসুন হাসুন। প্রাণ খুলে হাসুন। তবে একটা কথা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, তোমার বলদের চেয়ে অনেক বেশি দামি আমার বোতল।

মাইক কিন্তু তার কথায় এতটুকু গুরুত্ব দিল না। সে বেশ তাচ্ছিল্য করেই বলল, আমাকে কি তুমি বোকা পেয়েছ ? একটা খালি বোতলের জন্য আমার বলদটাকে দিয়ে দেব ?

খর্বকায় লোকটি বলল, বোতলটা নাও। এ বোতলের যা গুন তা আর অন্য কোথাও খুঁজে পাবে না। এ বোতলটাকে জীবনে ছাড়তে পারবে না। এ কথা আমি জোর দিয়ে বলছি।

মাইক আবার হো হো করে হেসে উঠল তার কথায়। লোকটা তখন তাকে অন্যভাবে বোঝাতে চাইল। বন্ধু, যে বলদটাকে তুমি শহরে নিয়ে যাচ্ছো বেচবে বলে, তা শহর পর্যন্ত পৌঁছাবে তো ? পথে যেতে যেতে যদি কোন চোর ডাকাতের পাল্লায় পড়, তাহলে তোমার অবস্থা কী হবে ? অনেক কষ্ট করে হয়তো তুমি বলদটাকে শহরে নিয়ে গেলে, কিন্তু কেউ তোমার কাছ থেকে বলদটাকে কিনল না। তখন কী করবে ? যা আশা করে যাচ্ছো তার থেকে যদি অনেক কম দামে বলদটাকে বেচে আসতে হয় তাহলে কী লাভ হবে ?

লোকটার কথায় খুব রাগ হল মাইকের। সে কোন উচ্চ-বাচ্য না করে তার পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় কানে এলো লোকটার গলা। সে চিৎকার করে বলল - বন্ধু, তুমি তোমার ভাগ্য ছুড়ে ফেলে দিয়ে যাচ্ছ। দয়া করে বলদটার বদলে আমার বোতলটা নিয়ে যাও। এতে তোমার লাভ হবে।

মাইক এবার ফিরে তাকাল লোকটার দিকে। সে যেন কেমন সম্মোহিত হয়ে গেল তার চোখের তারায়। মনে হল ব্যাপারটা দেখাই যাক না। অভাবের তাড়নায় এক এক করে সব গরু বলদ তো বিক্রি হয়ে গেছে, এটা গেলে তার আর কত ক্ষতি হবে ? তাও সে বলল, এই বলদটা যদি তোমাকে দিয়ে দিই, তাহলে কী জবাব দেব আমার স্ত্রীর কাছে ? কী করে আমি বাড়িভাড়া মেটাব ? কী করে সামলাবো অন্যান্য খরচ ?

লোকটি বলল, বন্ধু, তুমি এর জন্য একদম চিন্তু করো না। এই বোতলটা নিয়ে তুমি ঘরে ফিরবে। স্ত্রীকে বলবে ঘরটা ভালো করে পরিস্কার করে দিতে। চেয়ার টেবিল ভালো করে মুছে দিতে। তারপর একটা পরিস্কার সাদা কাপড় বিছিয়ে দেবে টেবিলের উপর। আর টেবিলের পায়ার কাছে রেখে দেবে এই বোতলটা। তারপর বোতলের দিকে তাকিয়ে বলবে, বোতল, তুমি তোমার কাজ কর। তারপরেই দেখতে পাবে বোতলের খেল।

মনে তবুও সংশয় ছিল মাইকের। কিন্তু লোকটি হাল ছাড়ল না। সে মাইকের পিছনে পিছনে অনেকটা দূর গেল। তাকে অনেক করে বোঝাল। অবশেষে বলদটা হস্তান্তর করে বোতলটা হাতে নিয়ে বাড়িতে ফিরল মাইক।

বাড়িতে ফিরে সে সমস্ত ঘটনাটা তার স্ত্রীকে বলল। মাইকের কথা শুনে খুব মর্মাহত হল তার বউ। তার বোকামো দেখে বিস্মিত হল। মুখে যা এলো তাই বলল মাইককে। মাইক তাতে রাগ করল না। সত্যি বোতলটাতে কিছু আছে কিনা তা পরখ করার জন্য নিজেই ভালো করে ঝাটা দিল ঘরটায়। মলির সহায়তায় টেবিলটা মাঝখানে রাখল। তার চারদিকে চারটে চেয়ার বসাল। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটা চাদর টেবিলের উপর বিছিয়ে দিল। খর্বকায় লোকটার কথামতো বোতলটা টেবিলের পায়ার কাছে রেখে দিল। তারপর দু'জনে

একযোগে বলল - বোতল তুমি তোমার কাজ কর।

আর তারপরেই ঘটতে থাকল আশ্চর্য সব ঘটনা। সশব্দে বোতলের ছিপিটা খুলে গেল আপনা আপনি। বোতলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো দুটো বলিষ্ঠ লিলিপুট। তাদের হাতে অনেকগুলো বাসনপত্র। তাতে অনেক খাবার দাবার। তার মধ্যে ছিল একটা সোনার প্লেট। তারা খাবারগুলো সব সাজিয়ে দিল টেবিলে। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল বোতলে।

মলি, মাইক এবং তাদের ছেলেপুলেরা খুব অবাক হয়ে গেল। তারা সকলে হাত মুখ ধুয়ে খেতে বসল। এরকম সুন্দর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন খাবার তারা আগে কখনো দেখেনি, খাওয়া তো দূরের কথা। গভীর আনন্দের সাথে তারা সেই খাবার খেলো। খাওয়া শেষ হতে না হতেই বোতল থেকে বার হয়ে এলো সেই ছোট্ট লিলিপুটেরা। তারা এঁটো বাসনগুলো সব গুছিয়ে নিয়ে আবার অদৃশ্য হল বোতলে। টেবিলের উপর পড়ে রইল সেই সোনার প্লেটটা। গোটা ঘটনাটা যেন ঘটে গেল ম্যাজিকের মত, তাদের চোখের সামনে। তারা অনেকক্ষণ ধরে এই ঘটনাটা নিজেদের মধ্যে পর্যালোচনা করে দেখল। আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের মতো মাইকের প্রয়োজনে লিলিপুট দুটো হাজির হয় আর কাজ কর্ম করে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

মাইক একদিন বাজারে গেল সোনার প্লেটটা বেচবে বলে। সেকরা সেই সোনার প্লেটটা নিয়ে কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখল। তারপর সেটা ওজন করল। খাতা পত্তরে হিসাব করে যা দাম বলল তা শুনে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল মাইকের। একটা সোনার প্লেটের দাম যে এত হতে পারে সে ধারণা তার ছিল না। যা হোক প্লেটটা বেচে টাকা পয়সা নিয়ে সে বাড়ি ফিরল। পথে নিজেদের পছন্দসই জিনিসপত্র কিনে আনল।

একদিন বাড়িওয়ালা তার বাড়িভাড়া নেবার জন্য মাইকের ঘরে গেল। ঘরে ঢুকে সে হতবাক হয়ে গেল। দেখতে পেল তাদের বাড়িতে প্রচুর পরিমাণ খাবার দাবার। প্রচুর আসবাব পত্র, সাজসরঞ্জাম। এরকম এলাহি খাবার দাবার জিনিসপত্র এলো কোথা থেকে ? কোন কাজ কর্মের মধ্যেই থাকে না আজকাল মাইক। তাহলে রাজার হালে তাদের সংসার চলে কী করে ? এসব ব্যাপার জানার জন্য মনটা তার আকুলি বিকুলি করে। কিন্তু প্রকাশ্যে সে কিছু জানতে চাইল না। সে তার মাসিক বাড়িভাড়াটা চাইল মাইকের কাছে। মাইক মুহূর্ত দেরি না করে ভাড়াটা মিটিয়ে দিল। টাকাটা হাতে নিয়ে বাড়ি ফিরল বাড়িওয়ালা। কিন্তু মনের মধ্যে থেকে গেল সেই সন্দেহের দোলা। এত টাকা পয়সা, এত বৈভব কোথা থেকে পেল মাইক ? কোথাও চুরি ডাকাতি করছে না তো ? কিংবা কোন গুপ্তধনের সন্ধান পায়নি তো ? আরো অনেক প্রশ্ন মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল বাড়িওয়ালার। কিন্তু সে সব প্রশ্নের কোন উত্তর ছিল না তার কাছে। সমাধানের কোন পথ ছিল না তার সম্মুখে। অগত্যায় একদিন মাইককে সরাসরি জিজ্ঞেস করল - ভাই মাইক, তুমি এত টাকা পয়সা কোথা থেকে পেলে ?

মাইক লোকটা ছিল অত্যন্ত সহজ সরল প্রকৃতির। তাই বিনা সংকোচে আসল কথাটা বলে ফেলল তার কাছে। কথাটার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য ঘরদোর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে টেবিলে চাদর বিছিয়ে করজোড়ে মাইক বলল — বোতল তুমি তোমার কাজ কর।

স্বভাবতই বোতল থেকে বেরিয়ে এলো সেই দুই লিলিপুট। সাথে নিয়ে এলো প্লেট ভর্তি কাটা ফল, গরম চা বিস্কুট, আরো অনেক কিছু।সেগুলো খেয়ে বাড়িওয়ালা বায়না ধরল - ওই বোতলটা আমাকে বিক্রি করতে হবে।

মাইক বলল, না আমি বোতল বেচব না।

বাড়িওয়ালা সে কথা শুনে খুব রুষ্ঠ হল। তাকে বাগে আনতে প্রথমে অর্থের লোভ দেখাল, ভাড়া বাড়িটা ওদের দিয়ে দেবে বলল। তাতে কাজ না হওয়ায় ভয় দেখাতে শুরু করল। প্রাণের ভয়ে প্রচুর টাকা পয়সা ও বাড়িটার বিনিময়ে বোতলটা বাড়িওয়ালাকে বিক্রি করে দিল মাইক। মনে মনে ভাবল যে অর্থ সে পেয়েছে তা দিয়ে তাদের চলে যাবে সারাটা জীবন। কিন্তু জীবনটা যে বড় কঠিন, বড় নির্মম তা বুঝতে পারল কয়েক মাস পরেই। রোগে ভোগে অনেক টাকা বেরিয়ে গেল। দু'দুবার বাড়িতে ডাকাত পড়ল। তারা বাড়ির সমস্ত কিছু ধুয়ে মুছে নিয়ে গেল। অবশেষে এমন অবস্থা দাঁড়াল, দু-বেলা দু'মুঠো আহার জোগাড় করতে পারছিল না মাইক।

একদিন তার স্ত্রী মলি তাকে বলল — মাইক, তুমি একটা বলদ নিয়ে আবার হাটে যাও। পথে যদি সেই লোকটার সাথে দেখা হয় তাহলে বদলে আর একটা বোতল চেয়ে নিয়ে এসো।

উপায়ন্তর না দেখে তাদের শেষ সম্বল বলদটাকে নিয়ে খুব সকালে বেরিয়ে পড়ল মাইক। পাহাড়ের পথে হাঁটতে হাঁটতে সে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ল। অবশেষে কোনমতে সে পূর্বের জায়গায় গিয়ে পৌঁছল। এদিক ওদিক সে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল। কিন্তু কোথাও সেই খর্বকায় লোকটিকে দেখা না পেয়ে খুব নিরাশ হল। অবশেষে চিৎকার করে ডাকতে শুরু করল। ভাই ! কেউ কোথাও আছো ?

মাইকের আর্তনাদ পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এল বারবার। কিন্তু কোন জবার পেল না সে। কিছুক্ষণ পরে সেই

খর্বকায় লোকটি আবির্ভূত হল তার সামনে। সে মাইককে দেখে চিনতে পারল। হাসতে হাসতে বলল, কি বন্ধু ! আমি কি মিথ্যে কথা বলেছিলাম ? আমি কি তোমাকে ঠকিয়ে ছিলাম ? মাইক বলল — না বন্ধু না। আমি জীবনে ভুলতে পারব না তোমার উপকার। ভোলা সম্ভবও নয়। কিন্তু...
খর্বকায় লোকটি সাথে সাথে জিজ্ঞেস করল — কিন্তু কী ?

অত্যন্ত দুঃখের সাথে মাইক বলল — তোমার দেওয়া বোতলের দাক্ষিণ্যে আমি একসময় আয়ার ল্যান্ডের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি হিসাবে পরিগণিত হয়েছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার। বাড়িওয়ালার অবিচারে, অত্যাচারে ভীত হয়ে বোতলটা তাকে বিক্রি করে দিয়েছিলাম। এখন বুঝতে পারছি আমি কী ভুল করেছি। কথাগুলো বলতে বলতে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল মাইক।

খর্বকায় লোকটি তাকে সান্তনা দেবার চেষ্টা করল। অবশেষে মাইক তার কাছে প্রার্থনা জানালো - বন্ধু, দয়া করে এই বলদটার বদলে আমাকে একটা বোতল দাও।

মাইকের কথা শুনে লোকটা চোখ পাকিয়ে খিক খিক করে হাসল। তারপর তার ঝোলা থেকে একটা বোতল বার করে মাইকের হাতে দিয়ে বলল - এটা নিয়ে যাও। আর বোতল নিয়ে কী কী করতে হবে তা তোমার জানা আছে। সেটা গিয়ে করে দেখ কী হয়।

বোতল পেয়ে মাইক যেন হাতে স্বর্গ পেল। তার সমস্ত দুঃখ কষ্ট মুহূর্তে লাঘব হয়ে গেল। তেজী ঘোড়ার মত সে উঠে দাঁড়াল। বলদের দড়িটা লোকটার হাতে ধরিয়ে দিল। তারপর তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাড়ির পথে রওনা হল মাইক।

ঘরে ফিরে মাইক চিৎকার করে বলল - কোথায় গেলে মলি ? দেখে যাও। আমি আর একটা বোতল নিয়ে এসেছি।মাইকের গলা শুনে ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল মলি। মাইকের হাতে বোতলটা দেখে খুব খুশি হল সে। মাইক কিছু বলার আগেই ঘরদোর সব পরিস্কার করে ফেলল। টেবিলের উপর একটা পরিস্কার চাদর বিছিয়ে দিল। নীচে পায়ার কাছে সেই বোতলটা রাখল। তারপর দু'জনে করজোড়ে আগের মতই বলল, ওহে বোতল, তুমি তোমার কাজ করো।

একথা বলে তারা বোতলের দিকে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে তারা দেখতে পেল দুজন ষণ্ডাগুণ্ডা শয়তান বার হয়ে এলো সেই বোতল থেকে। তারপর তারা দুজনে মলি ও মাইককে এলোপাতাড়ি মারতে শুরু করল। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা না মাটিতে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল ততক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের পেটাতে ছাড়ল না। মাইক ও মলি অজ্ঞান হবার পর তারা বোতলে ঢুকে গেল।

অনেকক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরল দুজনের কিন্তু গায়ের ব্যথা তাদের গেল না। কোনরকমে একে অপরকে ধরে উঠে দাঁড়াল। ঢকঢক করে বেশ খানিকটা জল খেলো, তারপর বিছানায় গিয়ে আবার শুয়ে পড়ল।

এই আকস্মিক বিপদের মুখে পড়ে দু'জনের চেতনা হল। এভাবে লোভের বশবর্তী হয়ে কোন কাজ না করা শ্রেয় বলে মনে হল। তারপর ভাবতে ভাবতে বাড়িওয়ালার কথা মনে পড়ল তাদের। সেও তো খুব লোভী। সে তো জেনে শুনে তাদের ঠকিয়েছে। তাহেল তারা সাজা পাবে না কেন ?

এসব কথা ভেবে মাইক মনে মনে একটা ফন্দি আঁটল। সে সন্ধ্যার দিকে বোতলটা নিয়ে বাড়িওলার বাড়িতে গেল। বাড়িওয়ালা তখন তার বন্ধু বান্ধব, অতিথিদের নিয়ে ভুরিভোজে ব্যস্ত ছিল। মাইকের হাঁক ডাক শুনে বাড়িওয়ালা বাইরে এল। মাইককে দেখে সে মনে প্রাণে বিরক্ত হল। ক্ষুব্ধ হল খুব। নিশ্চয়ই কোন দুরভিসন্ধি আছে মাইকের মনে। একথা ভেবে সে চিৎকার করে বলল — এই ভর সন্ধ্যেবেলায় আমাদের বাড়িতে এসেছ কেন ? কী অভিপ্রায় তোমার ?

বাড়িওয়ালার রক্ত চক্ষু উপেক্ষা করে মাইক ধীর স্থির কন্ঠে বলল — আপনি হলেন আমার বাড়ির মালিক। তাই ভাবলাম আপনাকে ব্যাপারটা জানানো দরকার। যাচ্ছিলাম আরেক প্রতিবেশির বাড়িতে। উনি আমাকে ডেকেছেন।

বাড়িওয়ালার বাড়ির পাশেই ঐ প্রতিবেশির বাড়ি। তার সাথে আবার বনিবনা নেই বাড়িওয়ালার। তার সঙ্গে সবসময় টক্কর দিয়ে চলে। তার নামে নিন্দে মন্দ করে বেড়ায়। তাই তার আগ্রহ গেল বেড়ে। তাই সে বলল, ওরা তোমায় ডেকেছে কেন ?

বোতলটা নেবে বলে। নির্লিপ্তের মত জবাব দিল মাইক।

চোখ কপালে তুলে বাড়িওয়ালা জানতে চাইল কী বোতল ? আপনাকে যে বোতল দিয়েছি তার থেকেও ভাল বোতল। দাম ভালো দেবে বলেছে। ভাবছি ওনাকে বোতলটা দেব। বাড়িওয়ালা বলল - তার আর কী দরকার ? তুমি আমার আপনজন হয়ে গেছ। আমার বাড়িতে বসবাস করছ। আমাকে না দিয়ে বোতলটা তাদের দেবে কেন ? উপযুক্ত মূল্য দিয়ে আমি কিনে নেব বোতলটা। তবে তার আগে আমি দেখে নিতে চাই, তোমার এই বোতলটা আগের বোতলের চেয়ে কতটা ভালো।মাইক বলল — বেশ। তাহেল চলুন। মূল্য নির্ধারনের আগে দেখে নিন বোতলের কার্যকারিতা।

বাড়িওয়ালা তখন মাইককে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেল। আমন্ত্রিত অতিথিদের সামনে একটা টেবিলে ভালো

একটা চাদর বিছিয়ে দিল। টেবিলের পায়ার কাছে রাখল বোতলটা। তারপর বোতলের সামনে হাঁটুমুড়ে বসে বাড়িওয়ালা বলল - ওহে বোতল। তুমি তোমার কাজ কর।

যেই না কথাগুলো বলল সঙ্গে সঙ্গে বোতল থেকে দু'জন ষণ্ডাগুণ্ডা লোক বেরিয়ে এল। আর বার হয়েই শুরু করল পেটাতে। কে মালিক, কে অতিথি, কে নিমন্ত্রিত , কে বউ কে ছেলে কোন কিছুই বাছবিচার করল না তারা, মারতে মারতে তাদের হাল বেহাল করে ফেলল। মাইক ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল। বাড়িওয়ালা তাকে চিৎকার করে বলল - ওহে মাইক। এদের হাত থেকে তুমি আমাদের বাঁচাও।মাইক বলল — বাঁচাতে পারি। তবে শর্ত একটাই। আগের বোতলটা আমার হাতে এনে দিতে হবে।

বাড়িওয়ালা এক কথায় রাজি হয়ে গেল। তার স্ত্রী ঘরের ভেতর থেকে বোতলটা নিয়ে এসে মাইকের হাতে দিল। মাইক বলল — এবার আপনারা সকলে শুয়ে পড়ুন।

মাইকের কতা মত যে যেখানে পারল শুয়ে পড়ল। সবাইকে শুয়ে পড়তে দেখে ষণ্ডাগুণ্ডা লোক দুটো বোতলের ভেতর ঢুকে পড়ল। মাইক আর এক মুহূর্ত দেরি করল না। বোতল দুটো নিয়ে সোজা বাড়ির পথে রওনা হল।

বাড়িতে ফিরে বোতল দুটিতে আলাদা আলাদা লেবেল মেরে সযতনে রেখে দিল আলমারিতে। তারপর প্রয়োজন মত বোতল বার করে তাদের চাহিদা মেটাতে থাকল। মাঝে মাঝে সোনার প্লেটও দিয়ে যেত লিলিপুটেরা। সেগুলো বাজারে বিক্রি করে প্রচুর ধনরত্নের মালিক হল মাইক। নতুন একটা বাড়ি বানালো শহরে। মনে আর কোন দুঃখ থাকল না তাদের। ভুলেও বাড়িওয়ালা আর কোনদিন মাইকদের বাড়িতে পা রাখেনি। কে জানে ষণ্ডাগুণ্ডা মার্কা লোক দুটোকে দিয়ে আবার যদি তাকে পিটিয়ে দেয়, সেই ভয়ে !

## দুই বোন দুই ভাই

### সমরকুমার চট্টোপাধ্যায়

টুকলু দাদার দুইখানি বোন সঞ্চিতা ও বনানী,
ভাইটি তাদের কালনা থাকে নামটি পরত তা জানি।
টুকলু সোনার সঞ্চিতা বোন গল্প ছড়ায় দু-দেশ মাতায়,
লিমেরিকেই ভর্তি থাকে বনানী তার পাতায় পাতায়।
পরত ভাইও কম কিছু নয়, ছড়ায় ছড়ায় ছড়াক্কার,
চাই ভাই-বোন মাতায় ভুবন ঢেউ তুলে মন ফরাক্কার।

## চাঁদমামা

### পরিমল ঘোষ

চাঁদমামা, তোমায় দেখে লাগে বেজায় ভালো,
বিশ্বজুড়ে ছড়াও তুমি মিষ্টি-মেদুর আলো।
সূর্য থেকে নাও তুমি নিত্য আলো ধার,
রাতের বেলা সেই আলো বিলাও চমৎকার।

তোমার বুকে নামলো মানুষ রাখলো মনের জেদ,
তবু তোমার রূপকথায় পড়েনি-কো ছেদ।
তোমার গায়ে কালো দাগ সবাই জানে বেশ,
তবু তোমার রূপ দেখে হয় না দেখার শেষ।

মহাকাশে ভেসে থাকো রূপোর থালার মতো,
তোমার রূপে মুগ্ধ হয় রসিক মানুষ যত।
যুগে যুগে সর্বজনের মন করেছ জয়,
কাব্যে-গানে তোমার কথা তাইতো লেখা হয়।


পশ্চিমবঙ্গের
জনপ্রিয় ছোটদের
পত্রিকা

সম্পাদকঃ অমল ত্রিবেদী
ইমেলঃ amaltuklu@gmail.com

গল্প

# বকুল আর লিচু রাজকুমার

## সঞ্জয় মিত্র

বকুলের কিছুতেই জ্বর কমছে না। আজ দশ দিন হয়ে গেল সেই বিছানাতেই পড়ে আছে। দিন রাত ওষুধ খেতে কারো ভাল লাগে ? এই অ্যাতো বড় বড় সাদা বড়ি আর কত রকমের ক্যাপসুল।

জানলার বাইরে তাকালে আরো খারাপ লাগে। আজ থেকে রথের মেলা বসেছে। বকুলদের বাড়ির ঠিক পিছনেই যে মাঠ, সেখানেই বসে মেলা। কারা সব ভেঁপু বাজাচ্ছে, প্যাঁ প্যাঁ, প্যাঁপ্পা প্যাঁ। শোনা যাচ্ছে জোরালো হাঁক, "নেবে নাকি গো বাকলের সরভাজা"। তার পায়ে বাঁধা ঝুমঝুমি বাজছে, ছিলিক ছিলিক ঝুম ঝুম। বাকল নিজে সরভাজা তৈরি করে নিয়ে আসে। অনেক দূরে তার গ্রাম। মা বাবা কেউ নেই। আছে শুধু এক মেসো। সে ভারি রাগি। তবে মানুষটা ভাল। সে ই বাকলকে মানুষ করেছে। সরভাজা তৈরি করতে সে ই শিখিয়েছে বাকলকে। বেচারা এখন আসতে পারে না। অনেক দিন ধরে বিছানায় শুয়ে। কী যে এক কঠিন অসুখ ধরেছে তার। হাঁটতে চলতেই পারে না প্রায়।

হঠাৎ দরজা খোলার শব্দ। আবার পাঁচির মা। হাতে গেলাস আর দু তিন রকমের ট্যাবলেট। পাঁচির মা বলল, "খেয়ে ফেল দিকিন চটপট। আমার আবা ডাঁইড়ে থাকার সময় নেই।"

"আমি ওষুধ খাব না। তুমি যাও তো।"

"ওমা, শোনো কতা। বলে ওষুধ খাবে না। ডাকি, মাকে ডাকি ?"

"শ্যাওড়া গাছের পেত্নী।"

পাঁচির মা চেঁচাতে লাগল, "ওমা, দেখে যাও। তোমার ছেলে কেমন গাল পাড়তে শিকেচে।"

বকুল বলল, "ঠিক আছে। চেঁচাও। আসুক মা। আমিও বলছি, তুমি দুপুরবেলা পুকুর ধারে বিড়ি খাও। আমি নিজে দেখেছি।" পাঁচির মা একহাত জিব কেটে বলল, "হেই গো সোনাবাবু। ও কতা বলে দিউনি যেন।"

"তবে জানালা দিয়ে ফেলে দাও ওষুধ।"

"এই রইল।যা খুশি কর গো যাও। আমি চললুম।"

বকুল টান মেরে ট্যাবলেটগুলোকে জানলা গলিয়ে ছুড়ে ফেলে দিল। পেঁপে গাছটার ওপরে কাকটা এতক্ষণ কা কা করে চেঁচাচ্ছিল। বকুলের কাণ্ড দেখে ও হাঁ করে তাকিয়ে রইল। তবে কাকেরা ভীষণ চালাক। ওটা যে খাবার নয় তা খুব ভাল করে জানে। ভেঁপুটা

বেজেই চলেছে, প্যাঁ পুঁউ উ....। বকুল জানে, মা রান্নাঘরে। বাবা সেই কোন সকাল বেরিয়ে গেছে। ফিরবে সেই রাতে। দিদু ঘরে বসে বসে পান ছিঁচছে। ছোটকাকা বাইরের ঘরে কার সঙ্গে কথা বলছে। বকুল গায়ের চাদরটা সরিয়ে পা টিপে টিপে বেরিয়ে পড়ল। ভয়ে বুকটা ধড়াস ধড়াস করছে। এই বুঝি কেউ দেখে ফেলে। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছে দিদুর পান ছেঁচা, ঠক্ ঠক্, ঠুক্ ঠুক্....।

এবারের নাগরদোলাটা কী দারুণ ! কেউ হাত দিয়ে ঠেলছে না। আপনা থেকেই ঘুরছে, বোঁ ও ও ও। ছেলে বুড়োর হাসি আর ধরে না। ওদিকে ঘুরছে ঘূর্ণি। চলছে ম্যাজিক। মিস্টার পটকারামের ম্যাজিকটা দেখার খুব ইচ্ছে বকুলের। কিন্তু কী করে দেখবে। একটা পয়সাও পকেটে নেই। আহা, পটকা রামের ম্যাজিকটা যদি দেখা যেত, কী মজাটাই না হত। পটকারামের চেহারাটা ঠিক কালী পটকার মত। সিগারেট খেতে খেতে চুলে আগুন ধরায়। আর দুম্ করে ফেটে যায় গোটা শরীর। ও মা, তক্ষুণি নাকি দেখা যায় পটকারাম হাত নাড়তে নাড়তে বেরিয়ে আসছে দূর থেকে।

সায়ের পুতুল, মেমে পুতুল, বোষ্টুমি পুতুল, কাবলি পুতুল, ঘোড়ায় চড়া রাজপুত্র, ঝুমুর পরা মেয়ের নাচ, এরা সব সাজানো আছে সামনের দোকানটায়। সায়েব পুতুলের সাজটা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। মাথার মুকুটটা সবুজের ওপর লাল ফোঁটা দেওয়া। ঠিক যেমন ছোটদির বইতে আছে, রূপনগরের রাজকুমার। কত রকমের জরির রাংতা। নাগরা জুতো। তাতে সাদা সাদা চুমকি বসানো। ও তো দেখা যাচ্ছে রাজকুমার পুতুল। তবে এরা সায়েব পুতুল বলছে কেন। কে জানে। দোকানি হাঁকছে, "ফুরিয়ে গেল, ফুরিয়ে গেল। সায়েব পুতুল, মেম পুতুল। হাতি পুতুল, ঘোড়া পুতুল। খুকু পুতুল, খোকা পুতুল। সাপ পুতুল, ব্যাঙ পুতুল... কি খোকাবাবু, পুতুল নেবে ?"

বকুল ঘাড় নেড়ে বলল, "না।"

"এই সায়েব পুতুলটা খোকাবাবুর খুব মনে ধরেচে। তাই না ? অনেক খান ধরে দেখতে চ।"

বকুলের একটু লজ্জা করছিল। দোকান থেকে সে সরেই যাচ্ছিল। কিন্তু ঠিক এই সময় হঠাৎ এমন জোরে বৃষ্টি এল যে এগোতেই পারল না। বৃষ্টি আর তার সঙ্গে দমকা হাওয়া। দূর ছাই। কেন যে প্রত্যেক বছর রথের সময় বৃষ্টি আসে। বকুলের শরীর কাঁপতে লাগল। আবার জ্বর আসছে হয়ত। বুড়ো পুতুলওয়ালাটা ডাকল, "ও খোকাবাবু। ভিতরে ঢুইকে এস না। আহা, মুখখান একেবারে শুইকে গেচে। কোথায় থাকা হয় গো বাবু, এইখেনে কাচে কোথাও ?"

বকুল বলল, "হ্যাঁ, এইখানেই। ওই যে পেয়ারা গাছ, পেছনে পেঁপে গাছ। ওইখানে। আচ্ছা পুতুলওয়ালা, তোমার ওই সায়েব পুতুলটার দাম কত ?"

"হেই গো ছেলে। কী যে বল্লে। সোনার চেয়ে সে কি দামি ? সোনার চাঁদ মুখ এমনিতেই দেখা হল। ও তুমি এমনিই নিয়ে যাও গে। দাম কি সবার হয়, খোকাবাবু ?" বলেই বুড়োটা কেঁদে ফেলল। তারপর চোখ মুছে সায়েব পুতুলটা বকুলের হাতে দিয়ে বলল, "যাও, এইবেলা খর খর বাড়ি চলে যাও বাপধন। বিষ্টিটা এট্টু ছাড়ান গেচে।"

বুড়ো কী যে বলল, বকুল কিছুই বুঝতে পারল না। আর ওমনি কেঁদেই বা ফেলল কেন কে জানে। তবে লোকটা খুব ভাল মনে হচ্ছে। এমন সুন্দর পুতুলটা এমনিই দিয়ে দিল।

পুতুলওয়ালা বলল, "ডাঁড়াও দিকি একটুকুন। একটা পেলাসটিকে মুড়ে দিই। ভিজে টিজে যদি যায়। বলা তো যায় না।" প্লাসটিকে মোড়া পুতুলটা নিয়ে বকুল হাঁটছে। এমন সময় হাতে কী যেন একটা নড়ে উঠল। এ কি রে বাবা। এ যে পুতুলটা। প্লাসটিকের মধ্যে ছটফট করছে। একটা গোঙানিও শোনা যাচ্ছে — "সীঁ সীঁও, সীঁ সীঁও। আমাকে বেরোতে দাও। নইলে মরে যাব।"

বকুল তক্ষুণি পুতুলটাকে বার করে দেখল সত্যিই পুতুলটা মানুষের মতই হাঁপাচ্ছে। সাজপোষাক লন্ডভন্ড, চুল উস্কোখুস্কো এক রাজকুমার। বকুল জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি মানুষ, না পুতুল ?" সায়েব পুতুলটা তখনও সীঁ সীঁ করে বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলে হাঁপাচ্ছে। সে বলল, "আর একটু থাকলেই আমি সত্যিই পুতুল হয়ে যেতাম। তুমি বাইরে নিয়ে এসে আমাকে বাঁচালে। আমি লিচুদেশের রাজকুমার।"

"লিচুদেশ ? সেটা আবার কোথায় ? তুমি তাহলে এরকম ছোট্ট পুতুল হয়ে আছ কেন ?"

"সব বলব।আগে আমাকে তোমার ঘরে নিয়ে চল।"

বৃষ্টিতে মাঠে প্যাচপ্যাচে কাদা। নাগরদোলাটায় লোক নেই। জিলিপি আর পাঁপড়ভাজাওয়ালারা কোথায় ঢুকে পড়েছে, কে জানে। খালি বাকলের সরভাজা এক মনে হেঁকে চলেছে, "নেবে নাকি গো, বাকলের সরভাজা। ফুরিয়ে গেলে আর পাবে না।" বাকলকে দেখে খুব কষ্ট হল। বেচারার হয়ত আজ একটাও বিক্রি হয়নি। বিক্রি না হলে ওর মেসোর জন্য ওষুধ কেনা হবে না। আজ ঘরে হয়ত রান্নাই হবে না। চাল কেনার পয়সা কোথায় পাবে ?

বকুল তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল নিজের ঘরে। ভাগ্যিস কেউ দেখতে পায়নি। ধড়াস করে দরজা বন্ধ করে বলল, এইবার বল তোমার কথা।

পুতুল বলল, "কী সাহস ! আমায় বলে কিনা ট্যাবলেট রাজা।"

"কে বলল ?"

"ঐ তো, দু-নম্বর তাকের ঝাঁটা হাতে ঝাড়ুদারটা।"

"আরে ধুর। কী যে বল কিছুই বুঝতে পারছি না। এই তো, একটু আগে কেমন সুন্দর কথা বলছিলে।"

"আর কী সুন্দর কথা বলব। কত কষ্টে আছি তা যদি জানতে। মাটির পুতুল হয়ে মরা মানুষের মত শক্ত হয়ে আছি। আজ কতদিন হয়ে গেল। আমার বুঝি হাত পা ব্যথা করে না। মাথাটা নাড়াতে ইচ্ছে করে না। তবু ছন্নু মিঞা মাঝে মাঝে কাপড় দিয়ে গা মুছে দিত। তাইতে একটু মেসাজ হয়ে যেত।

"ছন্নু মিঞাটা আবার কে ?"

"ওই তো, বুড়ো পুতুলওয়ালাটা। ও খুব ভাল লোক। ওর নাতিটা গত বছর কঠিন রোগে মারা গেল। তাকে ঠিক তোমার মত দেখতে ছিল। তোমাকে দেখে তার খুব মায়া। দেখলে না, আমাকে তুলে নিয়ে সে তোমার হাতে এমনি এমনিই দিয়ে দিল।"

"কী যেন বলছিলে, ঝাড়ুদার না কার কথা ?"

"হ্যাঁ, তবে সব খুলেই বলি। ওই উত্তরে গোলন্দা পাহাড়ের পিছনে যে দেশ, তার নাম লিচু। আমার বাবা সেখানকার রাজা। লিচু রাজ্য খুব সুন্দর। কিন্তু একটাই দোষ। কেউ কারো ভাল দেখতে পারে না। কেউ কারো জন্য কিছু করেও না। সবাই শুধু নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। কেউ কারো খোঁজও রাখে না। কারো বিপদে কেউ কাছে আসে না। কারো কিছু ভাল হলে সবাই হিংসেয় জ্বলে পুড়ে মরে। একবার দেশে ভীষণ বন্যা হল। সব ফসল নষ্ট হয়ে গেল। না খেতে পেয়ে অনেক মানুষ মারা গেল। যাদের ঘরে কিছু ফসল রাখা ছিল তারাই শুধু বেঁচে গেল। কিন্তু ভুলেও তারা কাউকে এক মুঠো ধান দিয়েও সাহায্য করল না। সেখানে চাষির সঙ্গে মাঝির ঝগড়া, কামারের সঙ্গে ছুতোরের রেষারেষি। ঝাড়ুদারের সঙ্গে মুচির চোখ রাঙারাঙি। এমন করে কি কোনো দেশের মানুষ বাস করে ? তুমি শুনেছ কোথাও ?"

বকুল বলল, "তোমরা রাজা হয়ে মানুষকে বোঝাতে পারোনি ?" লিচু রাজকুমার উত্তর দিল, "বাবা কতবার যে চেষ্টা করেছে, তার ঠিক নেই। একবার হাজারবাতি উৎসবের দিন সবাইকে হাজির করে বলা হল, শোনো সবাই। কী সুন্দর ফোয়ারা নাচছে। আতসবাজির আলোয় কেমন চারিদিক ঝলমল করে উঠছে। তোমারা আজ থেকে ঝগড়া থামাও। মিলেমিশে থাকো। দেখবে, সবার মন সব সময় খুশিতে ভরপুর থাকবে।... ও হো বকুল, হাজারবাতি রাতের কথা তোমাকে বলা হয়নি। এ আমাদের রাজ্যের সবচেয়ে বড় উৎসব। সারারাত ধরে বাজি পোড়ানো হয়, ঢাক বাজে, বাজনা বাজে, আরো কত কী হয়।"

"রাজার কথা সেদিন কেউ শুনল না ?"

"চাষি বলল, হ্যাঁ, ঝগড়া থামাও বললেই হল আর কী। নবীন মাঝির বাপ আমার বাপকে গালি দিয়েছিল কেন, সেইটে আগে বলুক। তবে ঝগড়া মিটতে পারে। নবীন মাঝি ভেংচি কেটে বলল, খেয়া নৌকো ভাড়ার টাকাটা দেয়নি কেন তোর বাপ, অ্যাঁ ? সেইটে চেপে যাচ্ছিস কেন... ওদিকে লাগল কামারে ছুতোরে ঝগড়া, শেষে মারামারি। জগু ঝাড়ুদারের এমনিতেই সব সময় মেজাজ লাল আগুনের মত হয়ে থাকে। মুচির সঙ্গে তার এমন তর্কাতর্কি লাগল যে সামাল দেয় কার সাধ্য। কী বলব তোমায়, সেদিনের আনন্দ উৎসব প্রায় সবটাই মাটি হয়ে গেল।"

হঠাৎ দরজায় খটখট। মা ডাকছেন, "সন্ধ্যেবেলা ঘরের দরজা এঁটে কী করছ ? দরজা খোল। দুধ এনেছি। খেয়ে নাও। জ্বরটা একবার দেখি।"

বকুল বলল, "এই রে। শীগগির লুকিয়ে পড় খাটের তলায়, কি ড্রয়ারের মধ্যে।"

লিচু রাজকুমার বলল, "আর যাই কর ড্রয়ারের মধ্যে রেখ না। দম বন্ধ হয়ে মরে যাব।"

বকুল ঝট করে তাকে খাটের তলায় চালান করে দরজা খুলে দিল। মা বললেন, "দরজা এঁটে কী করছিস ?"

"না, এমনিই।"

"এমনি আবার কী। ভয় টয় পাস নি তো। দেখি জ্বরটা দেখি।" কপালে হাত দিয়ে মা বললেন, "এখনও তো দেখছি জ্বর আছে। কাল আবার ডাক্তারবাবু আসবেন।"

এদিকে বকুল অস্থির হয়ে উঠেছে। কখন মা যাবে। চোঁ চোঁ করে দুধের বাটি শেষ করে বলল, "এই নাও।"

মা বেশ আশ্চর্যই হয়ে গেলেন। যে ছেলে একদম দুধ খেতে চায় না, সে এক নিঃশ্বাসে সবটা শেষ করে দিল। মুখে বললেন, "লক্ষ্মী ছেলে। জানলাটা বন্ধ করে দিচ্ছি। ঠান্ডা লাগিও না।"

মা চলে যেতেই একটু পরে দরজা বন্ধ করে বকুল বলল, "হ্যাঁ লিচু। তারপর কী হল, বল।"

রাজকুমার বলল, "আমার নাম লিচু নাকি। আমাদের দেশের নাম তো লিচু। ঠিক আছে, তুমি আমাকে ঐ নামেই ডাকতে পার, যদি তোমার ভাল লাগে। যাই হোক, একদিন রাজার জ্যোতিষী গণনা করে বললেন, মহারাজ, সময় ভাল নয়। সামনে ঘোর বিপদ দেখতে পাচ্ছি। কালভৈরব দেবের অভিশাপ লেগে গেছে। হয় বন্যায় সারা দেশ ভেসে যাবে, নয় তো মারাত্মক ব্যাধিতে সবাই মারা যাবে।"

রাজা বললেন, "সর্বনাশ। এখন উপায় ?"

জ্যোতিষী বললেন, "উপায় তো খুব একটা দেখতে পাচ্ছি না। মহাসিন্ধুর দৈববাণী শুনেছি নিজের কানে। এ রাজ্যের মানুষের ভীষণ পাপের বোঝা। একটাই উপায়। সে হল, কঠোর সাধনা। পুরো এক মাস সবাইকে মৌন হয়ে থাকতে হবে। রাতে উপবাস। এক মাস পরে অমাবস্যার দিনে সবাইকে ধ্যানে বসতে হবে একসঙ্গে। পুরো এক ঘন্টা।"

সবাই তো চটেই লাল। এ আবার কী। কে সারা রাত্তির না খেয়ে থাকবে। আর সবার সঙ্গে এক হয়ে বসে ধ্যান। ধুস, তাই আবার হয় নাকি। যত সব ভণ্ড জ্যোতিষীর পাগলামি। জ্যোতিষীর বিধান কেউ মানল না। এমন কী রাজার আদেশও না।

রাজ জ্যোতিষীর কথা কখনও মিথ্যে হয়নি। দেশের মানুষের ওপর কঠিন অভিশাপ লেগেছে। বন্যা মহামারী হল না বটে। তবে লিচুদেশের সব মানুষ একদিন হঠাৎ ছোট ছোট পুতুল হয়ে গেল। আর পুতুলদের ঠাঁই হয় কোথায় ? ঐ যে, ছন্নু মিঞার রথের মেলার দোকানে।

বকলু বলল, "তারপর ?"

লিচু রাজকুমার বলল, "তারপর আর কী। সেই থেকে চুপচাপ পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছি সবাই। এখন ঐ রথের মেলার দোকানে। এর আগে অন্য দোকানে ছিলাম। লোকেরা দাঁড়িয়ে দেখে। কেউ হাতে নিয়ে বলে, কী সুন্দর পুতুলগুলো। কোথা থেকে এনেছে গো ? একদম জ্যান্ত মানুষের মত।... কী করে বোঝাই তাদের... আমরা তো আসলে মানুষই। নিজেদেরই দোষে পুতুল হয়ে সঙের মত দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের খিদে নেই, তেষ্টা নেই, কিচ্ছু নেই।"

লিচু রাজকুমার অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, "একদিকে কিন্তু ভালই হয়েছে। যাদের দোষে আজ এই অবস্থা – ঐ যে, কামার, কুমোর, চাষি, মাঝি, যারা কেউ কারো ভাল চাইত না, কেউ কারো সঙ্গে মিশত না, কেউ কারো বিপদে এগিয়ে আসত না তাদের মনটা বোধ হয় আর ইরকম নেই।"

"কী করে বুঝলে ?"

"পুতুল হয়ে থাকলে কী হবে। এরা তো দেখতে পাচ্ছে সবই। এর আগে যেখানে ছিলাম সেখানে একদিন নাগরদোলা থেকে একটা লোক পড়ে গেল। বাপরে, কী রক্ত। রক্তে ভেসে যাচ্ছে সব। কত লোক জমা হল। তারা ধরাধরি করে তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। কয়েকজন আবার তার বাচ্চাটাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে তার মায়ের কাছে নিয়ে গেল।... এই মেলাতেই তো দেখেছি, এক পাঁপড়ওয়ালার সব কিছু বৃষ্টিতে ভিজে সর্বনাশ হয়ে যায় আর কী। তখন সবাই মিলে তার উনুনটা আবার ধরিয়ে দিল। একটা ঢাকা জায়গায় নিয়ে গিয়ে সেখানে বিক্রি করতে বসাল। তোমাদের দেশে সবাই যে ভাল লোক তা নয়। কিন্তু পরের বিপদে সবাই একসঙ্গে এগিয়ে আসে, সাহায্য করে। তাই মানুষ জোরালো। আমাদের মত দুঃখী নয়। এইসব দেখে মাঝরাত্তিরে নিতাই কামার বলল, বুঝলে রাজকুমার। আমাদের নিজেদের দোষেই এই শাস্তি। কালু নাপিত বলল, চল আমরা এখন থেকে এদের মতই হয়ে যাই। মিলে মিশে থাকি। অন্য সবাইও একসঙ্গে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই হবে।"

"আর ঝাড়ুদারটা ?"

"ঐ ঝাড়ুদারটা চিরকালই বদমাস। বলে, ট্যাবলেট রাজকুমার তোমাকেই তো এখন আমাদের হয়ে কালভৈরব দেবকে বোঝাতে হবে, যাতে আমরা নিজেদের দেশে মানুষ হয়ে ফিরে যেতে পারি।.. আর ঠিক ওই সময়ই তো তোমার হাতে আমাকে তুলে দিল ছন্নু মিঞা।"

বকুল বলল, "শোনো লিচু রাজকুমার। তোমার এখন অনেক কাজ। চল, তোমাকে আবার ছন্নু মিঞার দোকানেই রেখে আসি।"

"সে কী ? তোমার জ্বর। তোমার মা যদি বুঝতে পারেন ?"

"আমার আর একটুও জ্বর নেই। চুপি চুপি যাব আর আসব। ছন্নু মিঞা লোকটা খুবই ভাল। কিন্তু দাম না দিয়ে তার কাছে থেকে তোমাকে নিয়ে আসাটাও ভাল কাজ হয়নি। বেচারা গরিব মানুষ।"

বাইরে বৃষ্টি থেমে গেছে। কেমন সুন্দর ফুটফুটে তারা বেরিয়েছে। লিচু রাজকুমারকে কোলে করে বকুল আবার চুপি চুপি ছন্নু মিঞার দোকানে রেখে এল। ঠিক যে তাকে সে রাখা ছিল সেইখানে। পরদিন ডাক্তারবাবু এসে বললেন, "বকুল, তুমি একদম ভাল হয়ে গেল। আজ থেকেই তোমার খেলা টেলা শুরু কর। তার সঙ্গে পড়াশোনাটাও কিন্তু।"

বিকেলে বকুলের মাসতুতো দাদা আর দিদি জামাইবাবুরা বেড়াতে এলেন। তারা সব মেলায় পুতুলের খোঁজ করছিলেন। দিদি জামাইবাবুরা অস্ট্রেলিয়ায় থাকেন। জামাইবাবুর আবার নানান রকম পুতুলের খুব শখ।

কিন্তু পুতুল কোথাও পাওয়া গেল না। সবাই আশ্চর্য হয়ে বলতে লাগল, "আরে ছন্নু মিঞাটা গেল কোথায় ?"

কেউ জানেনা। শুধু বকুল জানে পুতুলরা কোথায়।

গল্প

# পুলিশ কা বাপ

## মনোরঞ্জন গরাই

দুপুর বারোটা। ফাল্গুন মাসের রোদ্দুরে গনগন করছে চারিদিক। একটা লরি রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছে। লরির ড্রাইভার লছমন হিন্দি গানের কলি গাইতে গাইতে ধীরে সুস্থে গাড়ি চালাচ্ছেন। খালাসি রামু পাশের সিটে বসে ওস্তাদজীর গান শুনছে আর চারপাশের উপর চোখ বোলাচ্ছে।

হঠাৎ দু'জনেরই চোখ চলে গেল দূরে পিচ রাস্তার উপর। সেখানে একজন উর্দিপরা পুলিশ অফিসার বাবাগো-ও -ও, মা গো ও-ও , বাঁচাও গো-ও -ও বলে চিৎকার করছে আর দৌড়াচ্ছে।

ড্রাইভার লছমন তা দেখে তার লরি নিয়ে পুলিশ অফিসারের কাছাকাছি গিয়ে লরি দাঁড় করিয়ে দিল এবং খালাসিকে কাছে গিয়ে ব্যাপারটা দেখে আসতে বলল।

কালনা থানার এস আই সুবীরবাবু পাঁচ কনস্টেবল নিয়ে ডিউটি করছিলেন রাস্তার ধারে এক বটতলায় । বেশ গরম পড়েছে। তবে পকেট গরম থাকায় তা গা সওয়া লাগছে। তাই ঘাড় আর কলারের মাঝে রুমালটা গুঁজে দিয়ে সময়টার পুরো দাম ওঠানোর জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন তিনি।

বাকি পাঁচ কনস্টেবল একটু ঢিলেঢালা হয়ে নিজেদের মধ্যে গাল-গল্পে মেতেছে। ওদের ঢিলেঢালা ভাব দেখে সুবীরবাবু বলে উঠলেন - অমন গোবরগণেশের মতো দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে ? সবাই স্মার্ট হয়ে দাঁড়াও। আজ যেন একটা গাড়িও আমাদের ফাঁকি দিতে না পারে।

কিন্তু তাঁর অদৃষ্টে হয়তো আজ অন্যরকমই লেখা ছিল। কে জানত দেড় হাত লম্বা ময়লা রুমাল যেটা কিনা তিনি গরম থেকে বাঁচার জন্য ব্যবহার করছেন সেটাকেই তাঁকে যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে হবে ?

আজকের এই দুপুরে খান তিনেক গাড়ি দাঁড় করিয়ে ওদের কাগজপত্র ঘাঁটাঘাটি করে, নাকের ডগার চশমা ওঠানামা করে মাঝে মধ্যে বিরক্তি প্রকাশ করতে করতে দূরের নাদুস-নুদুস লরিটার দিকে লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলেন সবীরবাবু।

দূরের লরিটাকে দেখিয়ে তিনি হুঙ্কারের সঙ্গে বললেন - তৈরি হও.. ওটার আজ নিস্তার...

বিপজ্জনক ঘটনাটা ঘটল ঠিক তখনই। প্রথমটা নাকের সামনে দিয়ে উড়ে গেল।

পরেরটা একটু বেশি আওয়াজ করে। মালবোঝাই লরিটা তাঁর চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সঙ্গে সঙ্গে সোঁ – সোঁ – আওয়াজটা কীসের তা মালুম করার চেষ্টা করলেন। আর ততক্ষণে প্রথম কামড়টা পেলেন ঘাড়ে। তারপরে কানের লতিতে। তারপরে পিঠে। ভালো করে বোঝার আগেই পেলেন আরও কামড় এবং দেখলেন একটা কালো মেঘ রোদকে আংশিক ঢেকে তাঁর দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে। ভালো করে দেখে বুঝলেন সেটা হল একটা মৌমাছির ঝাঁক।

ততক্ষণে অন্য কনস্টেবলরা পড়িমরি করে দৌড় লাগিয়েছেন যে যেদিকে পারেন এবং বটতলার লোকজন সকলেই হাওয়া। সুবীরবাবু পিচ রাস্তা ধরে জোরে ছুটতে থাকেন। দৌড়তে দৌড়তে তাঁর মাথার টুপি খসে গেল, হাতের কাগজপত্র হাওয়ায় উড়ে গেল। তবু শেষ চেষ্টা করে অর্থাৎ গলার রুমালটাকে মাথার উপর বন্ বন্ করে ঘোরাতে ঘোরাতে ছুটতে থাকেন তিনি। কিন্তু তাতে কী বাঁচা যায়। একের পর এক মৌমাছি সুবীরবাবুর শরীরে হুল ফোটাতে থাকে।

লরির মোহ ত্যাগ করে তিনি চিৎকার করে দৌড়তে থাকেন। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল মৌমাছির পাল আক্রমণ করলে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে হয়। যদিও সজ্ঞানে কোনদিন তিনি মাটিতে গড়াগড়ি দেননি তবু প্রাণ বাঁচাতে তেতে ওঠা পিচ রাস্তাতেই তিনি গড়াগড়ি দেওয়া শুরু করলেন।

লরি চালক লছমনের কথামত খালাসি রামু সুবীরবাবুর গড়াগড়ির জায়গায় গিয়ে বুঝলেন ব্যাপারটা গুরুতর। রামু ইশারায় লছমনকে ডেকে দেয়। লছমন কিছু আন্দাজ করে লরিটা সেখানে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং সুবীরবাবুকে লরিতে চাপিয়ে নেয়।

প্রায় তিন কিলোমিটার লরি চালানোর পর এক নিরিবিলি গছতলায় সুবীরবাবুকে নামিয়ে আনে এবং চোখমুখে জলের ছিটে দেয়।

মিনিট পনেরো পর থানা থেকে গাড়ি এসে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করে। সুবীরবাবুর চোখমুখ ফুলে গিয়েছে। বাকি পাঁচ জন পুলিশও কমবেশি আহত হয়েছেন। তবে সুবীরবাবুর মতো ভয়ঙ্করভাবে কেউ আক্রান্ত হননি।

হাসপাতালের বেডে শুয়ে তিনি বলছেন, পুলিশে চাকরি করিতো, আমাদের অনেক হ্যাপা, তবে এমন ভয়ঙ্কর পালটা আক্রমণের মুখে কোনদিন পড়িনি।

আর ড্রাইভার লছমন হেসে বলছেন - পুলিশ চোর কে পিছে ভাগ্‌তা হ্যায়, এহি হম্ জানতে হ্যায়, লেকিন মধুমক্‌সী তো পুলিশ কা বাপ নিকলা... হায় রাম। পুলিশ ছুঁনে সে শোনাহে ছত্রিশ ঘাও হোতে হে.. লেকিন মধুমক্‌সী ছুঁনে সে তো সোও ঘাও হো গয়া।

## টুকুন

**বিধান শীল**

টুকুন, টুকুন ছোট্ট টুকুন
কথায় কথায় বায়না,
মায়ের কাছে মার খাবি জোর
এ দিকে তুই আয় না।
পড়ার দিকে মন নেই তোর
মুখের বিশাল জোর,
মুখ না ধুয়ে খেতে বসিস
উঠিস অনেক ভোর।
বইয়ের বোঝায় পিঠটা পুরো
গেছে রে তোর নুইয়ে,
আর ক'দিন পরেই কী রে
মুখ ঠেকবে ভুঁয়ে।
বই খাতা রেখে দিয়ে
আমার কাছে আয়,
ফুলের বনে দু'জনাতে
খেলতে যাবো ভাই।

## ছাগল

**বাপ্পাদিত্য পাণ্ডে**

ওরে পুনু যাসরে কোথায় করিস কী যে কাজ
সেই ছাগলের কথা বলি শুনে যা তুই আজ।
এক যে ছাগল নয়তো পাগল লম্বা দুটি কান,
খাবার লোভটা বেজায় তারই ঘাসের প্রতি টান।
গুলির মতো দেখতে জানিস তারই দুটো চোখ
অকাজেতে একগুঁয়ে সে মত্ত এমন রোখ।
সেই ছাগলটাই হাসে আবার দেখায় যত দাঁত।
কাঁপে শুধু ভূতের ভয়ে এলেই আঁধার রাত।
এমন ছাগল মানেই আমি বলছি কথা তোর
ছাগল হয়ে এবার তবে মাঠে মাঠেই ঘোর।
সত্যি কথা বলি বলে পুনুর সে কী রোষ,
মারতে আসে পুনু আমায় আমার কী যে দোষ !

গল্প

# পান্তাবুড়ি

## সুচিত চক্রবর্তী

পাড়ায় পান্তাবুড়িকে কে-না চেনে। এলাকায় পান্তাবুড়ির বেশ নাম ডাক আছে। কেন থাকবেনা। এলাকায় পান্তাবুড়ির দাপটে সবাই অস্থির। তোমরা হয়তো ভাবছো ওনার নাম কেন পান্তাবুড়ি হল। আসলে ছোট বেলা থেকেই পান্তাবুড়ি একটি লঙ্কা ও একটা পেঁয়াজ দিয়ে এক থালা পান্তাভাত খেয়ে নিত। সকালবেলায় পান্তা না পেলেই হৈ চৈ করে বাড়ি কাঁপিয়ে দিত। তারপর থকেই এলাকায় সবাই পান্তাবুড়ি বলে ডাকে।

সেদিন সাতসকালে পান্তাবুড়ি সারাপাড়া কাঁপিয়ে এমন চিৎকার করল যে সবার ঘুম ভেঙে গেল। হৈ হৈ করে এলাকাবাসী পান্তাবুড়ির সদর দরজার কাছে এসে জড়ো হল।

চিৎকার করা পান্তাবুড়ির স্বভাব। পান্তাবুড়ি কখনও কখনও ছোট্ট ঘটনাকে এমনভাবে সাজায় যে এলাকাবাসী ক্ষেপে যায়। কেউ কেউ বলে, আরে পান্তাবুড়ির কথা কানে নিস কেন ? পান্তাবুড়ির মাথার স্ক্রু যে একটু ঢিলে আছে।

আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে ঠাকুরকে প্রণাম করে দরজা খুলেই পান্তাবুড়ি অবাক। দ্যাখে দরজার কাছে দু'তিনটে মাছের টুকরো পড়ে আছে। গতমাসেও দু'তিনদিন বাড়ির উঠোনে মাছের কাঁটা ও মাছের টুকরো পান্তাবুড়ির নজরে পড়েছে। ক'দিন আগে পালপাড়ার এক জ্যোতিষী পান্তাবুড়ির হাত দেখে বলেছে, কেউ তাকে তুকতাক করবার জন্যে এসব করছে। মাসখানেক আগে কোন এক টিভি চ্যানেলে এক জ্যোতিষীর মুখ তন্ত্রমন্ত্র তুকতাক সম্বন্ধে আলোচনা শুনেছে পান্তাবুড়ি। সে এমনিতেই সন্দেহ বাতিক। কাওকেই বিশ্বাস করেনা। বাড়িতে চার ঘর ভাড়াটে আছে। এদের মধ্যেও তো কেউ এ কাজ করতে পারে। তা-ও উড়িয়ে দিতে পারছে না পান্তাবুড়ি। এবার কোন কিছুর তোয়াক্কা না করে সরাসরি ভাড়াটে চামেলি বউদির নাম ধরে তাকে সোজাসুজি অপারাধী হিসেবে চিহ্নিত করল।

আশ্চর্য ! পান্তাবুড়িকে কে তুকতাক করবে ? তিন কাল গিয়ে যার এককালে ঠেকেছে। বিষয় সম্পত্তিও তেমন নেই। ভাড়ার টাকায় সংসার চলে। এমন মানুষকে তুকতাক করে কী লাভ ?

দূর সম্পর্কের এক নাতনি পান্তাবুড়ির কাছে থাকে। মাঝে মাঝে সেই নাতনিও পান্তাবুড়ির কাজকর্মে অখুশি হয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে চায়। পান্তাবুড়ি নাতনিকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে কোনরকমে রাগ ভাঙায়।

এলাকার মানুষ বাবুদাকে বেশ শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে পান্তাবুড়ি। সেই বাবুদা পান্তাবুড়ির মুখোমুখি দাঁড়ায়। বলে, এটা কাকের কাজ। কাক মুখে করে এনে এখানে ফেলে। এর আগে দু'তিনদিন আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

—আশ্চর্য, তুই আমাকে একথা বলিস নি কেন ? পান্তাবুড়ি বলে। জানাবার সময় পেলাম কখন। অফিসের কাজে এত ব্যস্ত যে কারোর সাথে কথা বলার সময় পাচ্ছি না। পান্তাবুড়ি এবার মৃদু হেসে বলে, আসলে কী জানিস বয়স হচ্ছে তো, তাই চট করে মাথা গরম হয়ে যায়।

রূপকথার গল্প

# জলপরি আর কালো মাকড়সা

## সুদীপ্ত মণ্ডল

অনেক কাল আগে আরব সাগর তীরে থাকতো এক জলপরি। সে যেমন নানা রকম জাল বুনতে পারতো, তেমনিই পারতো নাচ-গান। অনেকেই তার কাছে আসতো কিছু না কিছু শিখতে।

একদিন জলপরি শীতের সকালে রোদ ঝলমলে সাগরপাড়ে বসে যখন জাল বুনছে ঠিক তখনই তার কাছে উড়ে এলো এক প্রজাপতি। প্রজাপতিটির গায়ে ছিল নানারঙের বাহারি পোশাক। সে তার দুই ডানা নেড়ে চোখ পিট পিট করে বলল, "জলপরি আমি তোমার কাছে নাচ শিখতে চাই।"

নতুন কাউকে শিষ্য করার আগে জলপরি তাকে একবার পরিক্ষা করে নিতো। তাই সে প্রজাপতিকে বলল, "তুমি কি মনে করো তুমি নাচ ঠিকমতো শিখতে পারবে ?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। দেখছো না আমি কেমন সুন্দর নাচের পোষাক পরে রয়েছি। তাছাড়া আমি খুবই চটপটে তাই আমি খুব ভালো নাচিয়ে হতে পারবো।"

প্রজপতির কথা শুনে জলপরি বুঝলো যে প্রজাপতিটি খুবই অহংকারী এবং নিজের সম্পর্কে সে প্রয়োজনের তুলনায় বেশিই আত্মবিশ্বাসী। শেষমেষ প্রজাপতির জোরাজুরিতে অনিচ্ছা সত্বেও তাকে নাচ শেখাতে রাজি হল কোনমতে।

এর ঠিক দু'দিন পর জলপরির কাছে এসে হাজির হল ঝুঁটিওলা এক টিয়াপাখি। টিয়াপাখি এসেই ঠোঁট ফাঁক করে মিষ্টি আওয়াজ বের করতে শুরু করল। জলপরি টিয়ার উদ্দেশ্যে বলল, "বলো, তুমি কী শিখতে চাও ?"

"আমি গান শিখতে চাই" টিয়া বলল।

"ও, তা তুমি কি মনে করো যে তুমি গান শিখতে পারবে ?"

"কী অদ্ভুত ! আমার এমন সুরেলা কন্ঠ শুনেও তুমি বুঝতে পারছো না যে আমার

গলা ভালো। আমি যে একজন নামজাদা গায়ক হবো তাতে আর সন্দেহ কী!"

জলপরি বুঝল যে টিয়া আত্মতুষ্ঠিতে ভুগছে। উৎসাহ বোধ না করলেও সে তাকে গান শেখাতে রাজি হল।

আরও দু'দিন পর সাগরতীরে হাজির হল এক কুচকুচে কালো মাকড়সা। জলপরি এবারও মাকড়সাকে জিজ্ঞাসা করল, "এবার বল, তুমি কী শিখতে এসেছো ?"

"আ-আমি মানে একটু জালবোনা শিখতে চাই।" খুবই অনুনয়ের সাথে বলল মাকড়সা।

"বেশ, তা তোমার নিজের কী ধরণা ? তুমি কি জালবোনা ঠিকমত শিখতে পারবে ?"

"মশা-মাছি ধরতে আমার জালবোনা শেখা খুবই জরুরি। আমি খুব চেষ্টা করব শিখে নিতে। আসলে আমার বুদ্ধি বেশি নেই তাই আপনি যদি অনুগ্রহ করে শেখান তবে খুব উপকার হয়।"

হঠাৎ হাসির রোল উঠল। মাকড়সার কথা শুনে প্রজাপতি আর টিয়া হেসেই লুটোপুটি। প্রজাপতি বলল, "ওহে মাকড়সা, তোমার ঘটে বুদ্ধি নেই ঠিকই, নইলে নিজেই নিজেকে বোকা বলো। হাঃ হাঃ হাঃ।"

"বিশেষ করে ঐ মশা-মাছি ধরার কথা শুনে তো আমি হেসেই খুন। হিঃ হিঃ হিঃ" টিয়া পাখি বলে উঠল।

জলপরি কিন্তু মাকড়সার কথাবার্তায় বেশ খুশিই হল।

তিনজনেই জলপরির কাছে যার যার পছন্দমত বিদ্যা শিখতে লাগল। প্রজাপতি আর টিয়া চলে খুবই গুমোরের সাথে। মাকড়সাকে তারা বেশ তাচ্ছিল্যই করে। মাঝে মাঝে চলে তাকে নিয়ে মস্করা, হাসি ঠাট্টা।

দেখতে দেখতে গ্রীষ্মকাল এসে গেল। এতদিনে বাহারি প্রজাপতি তার বাহারি পোষাক সত্বেও দু'পাখা নাচিয়ে কেবল নাচের একটিই মাত্র মুদ্রা শিখতে পেরেছে আর তাই শিখেই সে ফুলে ফুলে উড়ে বেড়াচ্ছে। ওদিকে টিয়াপাখিও মাত্র দু'একটি ডাক শিখেই ভেবে নিয়েছে যে সে মস্ত গায়ক হয়ে গেছে। জঙ্গলে ফিরে সে তার এই বিদ্যা জাহির করে আর সবার কান ঝালাপালা করে দেয়।

মাকড়সা কিন্তু তার সাধনা থামালো না। এক বছরের দীর্ঘ অধ্যবসায়ের ফলে সে জাল বোনার সম্পূর্ণ কৌশল চমৎকার ভাবে রপ্ত করল। এখন বর্ষা কাল, এখন জলপরির সমুদ্রের তলায় তার প্রাসাদে ফিরে যাবার সময়। সে তার যোগ্য উত্তরসূরী তৈরি করে দিতে পেরেছে। দীর্ঘকাল অক্লান্তভাবে ও কঠোর পরিশ্রম করে মাকড়সা এখন জলপরির চেয়েও ভাল জাল বুনতে শিখেছে।

## খুশির নদী

### অনিতা অধিকারী

ইচ্ছেটা যেই সব বাধা ঠেলে ডানা মেলে দিতে চায়
ঠিক সে সময় পূবের সূর্য উঁকি দিয়ে ডাকে – আয়।
ইচ্ছেটা যেই জলপোকা হয়ে আঁকিবুকি কাটে জলে
গন্ধ নিবিতো আয় কাছে আয় – কমলিনী ডেকে বলে।
ইচ্ছেটা যেই ঘুম হয়ে দেয় আঁধারের পথে পাড়ি
চাঁদ হেসে কয় — এবার আমারে যেতে দাও পথ ছাড়ি।
ইচ্ছেটা যেই পাহাড়ের কোলে ঝরণাকে ছুঁতে যায়
আকাশ তখন সব কালো মুছে নীল রং মাখে গায়।
ইচ্ছেটা হয় একমুঠো রোদ ঝুপড়িতে দেয় উঁকি
ছেঁড়া কাঁথা ফেলে, খোকা-খুকু খ্যালে ছায়ার সঙ্গে টু-কি।
ইচ্ছেটা যেই বাদাবন ঠেলে রাখালের বেশে হাঁটে
মন বলে – ভাই তোর পিছু পিছু দিন খানা বেশ কাটে।
সাগর পারের রূপকথাপুর ইচ্ছেটা দ্যাখে যদি
বিস্ময়ে সেই মন হয়ে যায় একটা খুশির নদী।

## ভোরের পাখি

### অশ্রুরঞ্জন চক্রবর্তী

ভোরের পাখি, ভোরের পাখি, ওরে ভোরের পাখি
সারা আকাশ মাতিয়ে রাখিস কিচির -মিচির ডাকি।
ডেকে ডেকে বলিস শুধু — সবাই ডেগে ওঠো
আধফোটা সব ফুলকলিরা ফুল হয়ে সব ফোটো।
জেগে ওঠো শহর ও গ্রাম, লাগো সবাই কাজে
অলসতা ঝেড়ে ফেলে সাজো নতুন সাজে।
পুবের আকাশ আলো করে উঠছে সোনার রবি
রামধনু-রং ছড়িয়ে দিয়ে আঁকছে কত ছবি।
যাচ্ছে হেসে মিষ্টি বাতাস সবুজ পাতার বুকে
হেলেদুলে নাচছে ওরা মনের গভীর সুখে।
ভোরের পাখির গানটি শুনে তাইতো সবাই জাগে
তর্ক করে সব ছোটরা — কে উঠেছে আগে।
সে সব শুনে ভোরের পাখি বলছে হেসে হেসে
আয়না কাছে জড়িয়ে ধরি একটু ভালোবেসে।

গল্প

# কনস্টেবল ভীতুরাম

## জন পূততুণ্ড

রাতের অন্ধকারে ওপার থেকে দুস্কৃতীরা এপারে এসে ডাকাতি করে পালিয়ে যায়। এ দৈনন্দিন ঘটনা। তাই থানা থেকে ভীতুরামের মতো আরও কয়েকজন কনস্টেবলের আজকাল রাতের বেলা ডিউটি পড়ে এই ঘাটে। তাতেই কয়েক মাস একটু নিশ্চিন্তে এপারের লোকজন ঘুমোতে পারছিল।

বেশ কয়েক মাস পরে একদিন ওইরকম রাতের অন্ধকারে ডাকাতি করতে এসে তিনজন ডাকাত ধরা পড়ে যায় ওই নাইট গার্ডদের হাতে। থানায় পাকড়াও করে নিয়ে এসে পরদিন তাদের কোর্টে চালান করে দেওয়া হয়। জজসাহেব তাদের ছয় মাসের জেল হাজতের রায় দেন। ওদের জেলে নিয়ে যাওয়ার সময় ভীতুরামকে একজন ডাকাত বলে, "খুব সাবধান, ফিরে আসি তারপর তোমায় কোতল করব !"

এই হুঁশিয়ারিতে ভীতুরাম খুব ভয় পেয়ে যায়। ঠিক করে — সাহেবকে বলে দেবে যে, সে আর রাতের ডিউটি করতে পারবে না। সাহেবকে একথা বলতে সাহেব রামচরণকে বলে, "তোমার নাম রামচরণ রাখাটাই ভুল ছিল তোমার বাবা-মায়ের। ঠিক আছে তুমি এবার থেকে থানাতেই ডিউটি করবে। আর একটা কথা, আজ থেকে তোমার নাম ভীতুরাম রাখলাম।"

আসলে এই ঘটনার পর থেকেই তার নাম ভীতুরাম হয়েছে। আসলে তার নাম রামচরণ হালদার।

কয়েক বছর পরে রামচরণ তাঁর একমাত্র ছেলেকে তার এই ডাকনামের ঘটনাটা জানায়। ছেলে বিল্টু খুব সাহসী, সে বাবাকে বলে, এতে ভয় পাও কেন ?

রামচরণ বলেন, আসলে তোকে নিয়েই তো যত দুশ্চিন্তা। আমার যদি কিছু হয়ে যায়, তবে....। বিল্টু প্রত্যুত্তরে বলে, বাবা ভয় পেয়ো না, ওরা আমাদের কিচ্ছু করতে পারবে না।

বিল্টুদের বাড়ির পিছনেই বিশাল আমবাগান। সেই আমবাগান ছিল বনজঙ্গলে ভরা, তাতে ছিল শেয়াল, ভামবিড়াল। সে শুনেছে সেখানে নাকি ভয়ানক সব সাপেদের

বাস। এছাড়াও আছে নাকি সজারু। আর তারই মাঝে ছিল পরগাছায় ঢাকা একট পড়ো বাড়ি। সবাই বলে সেখানে নাকি ভূতের বাস। অনেকসময় সেখান থেকে বিকট শব্দ ভেসে আসত। আর রাতের বেলা সেখানে আগুন জ্বলতেও দেখেছে অনেকে। তাই আমবাগানে গেলেও কেউ ওদিকে পা বাড়াত না।

সেবার কালবৈশাখী ঝড় উঠেছে দেখে বিল্টু অন্যদের মতো আমবাগানে আম কুড়োতে ছুটল। কয়েকটা আম কুড়োতে না কুড়োতে ঝড়ের গতি ক্রমশই তীব্রতর হতে থাকল। অনেকেই বাড়ি ফিরে গেল। কিন্তু বিল্টু তখনও আম কুড়িয়েই চলেছে।

ঝড়ের সঙ্গে প্রবল বেগে বৃষ্টি শুরু হল, সঙ্গে বজ্রপাত। চারধার অন্ধকার হয়ে গেছে। বিল্টু কিছু না বুঝতে পেরে নিজেকে বৃষ্টি ও বজ্রপাত থেকে বাঁচাতে সেই পড়ো বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিল। বাড়িটার সামনের দিকটা প্রায় ধ্বংসস্তূপ। ও আরও ভিতরের দিকে প্রবেশ করল। প্রায় দেড়-দু'ঘন্টা এই ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রপাতের দাপট থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে যখন দেখল যে এবার কিছুট স্বাভাবিক হচ্ছে চারদিক, তখন ও সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে গিয়ে শেয়ালের ডাক শুনে একটা দেওয়ালের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে নিল। সে তারপর শুনল ওর পিছন দিক থেকে আরও কয়েকটা শেয়াল একসঙ্গে হুক্কা-হুয়া, হুক্কা-হুয়া করে ডেকে উঠল।

সে আড়াল থেকে সামনে-পিছনে লক্ষ করতে লাগল। এমন সময় লাল সালুতে জড়ানো এক সাধু, মাথায় তাঁর জটা, যা প্রায় তাঁর কোমর অবদি নেমেছে, মুখে লম্বা দাড়ি বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে সেই প্রথম শেয়ালটির মতো ডাক দিতে দিতে তার দিকে এগিয়ে আসছে। সে ভয় পেয়ে গেল। তবু চুপ করে রইল। সাধুটা তার পাশ দিয়ে একটু এগোতেই বিল্টু আড়াল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু পাশের দেওয়াল থেকে একটা ইট খসে পড়ল। আর সাধুবাবা ইট খুলে পড়ার শব্দ পেয়ে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে ফেলল বিল্টুকে। সঙ্গে সঙ্গে সাধুবাবা বলল, কোথাও নড়বি না। খুব সাবধান।

বিল্টু দাঁড়িয়ে পড়ল। সাধুবাবা কাছে এসে বলল, এখানে কী করছিস ? জানিস না এখানে ভূতের বাস। তাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটলে, ঘাড় মুটকিয়ে দেয়।

বিল্টু এবার একটু সাহস নিয়ে বলল, আসলে আম কুড়োতে এসেছিলাম। কিন্তু প্রবল ঝড়-বৃষ্টি -বজ্রপাতের থেকে বাঁচতে এখানে ঢুকে পড়েছিলাম। সাধুবাবা বলল, তুই সত্যি বলছিস ! কিন্তু তোর আম কুড়োনোর থলি কই ?

আসলে দৌড়ে আসতে গিয়ে ওই ওখানে পড়ে গেছে। সাধুবাবা বিল্টুর ইশারা অনুসারে সেদিকে তাকিয়ে দেখল থলেটা পড়ে আছে মাটিতে। যাও গিয়ে থলেটা নিয়ে এসো।

বিল্টু তাড়াতাড়ি থলেটা কুড়িয়ে নিয়ে এসে বলল, আমি কোনও দোষ করিনি। আমাকে বাড়িতে যেতে দিন।

সাধুবাবা হাসিমুখে বলল, ভয় নেই, আয় আমার পিছু পিছু। বিল্টুর মনে ভয় থাকলেও সে সাধুবাবার পিছু পিছু একটা ঘরে গিয়ে প্রবেশ করল। সেখানে আরও কয়েকজন লোক ছিল। তারা সাধুবাবাকে দেখে বলল জয় গুরুদেব !

সাধুবাবা তাদের একজনকে বলল, যাও এই ছেলেটার জন্য ওর থলেটাতে আম ভরে দাও। আর ওকে ওই আমবাগানটা পার করে দিয়ে এসো।

তারপর সাধুবাবা বিল্টুর দিকে তাকিয়ে বলল, যাও বাড়ি চলে যাও, কিন্তু কাউকে এখানে আমাদেরকে দেখেছ বা আমরা যে তোমাকে আম দিয়েছি সে কথা বলবে না। একটু থেমে আবার বলল, এবার থেকে যদি কখনও আম কুড়োতে আসো, তবে কাউকে না জানিয়ে এখানে আমাদের এই ঘরে চলে আসবে, আমরা তোমাকে থলেভর্তি আম দিয়ে দেব।

বিল্টু সাধুবাবাকে বলল, আপনার কোনও চিন্তা নেই, আমি কখনও কাউকে আপনাদের কথা বলব না। মা কালীর দিব্যি !

সে বাড়ি ফিরে এল। থলেভর্তি আম তার মায়ের হাতে দিয়ে বলল, মা খুব শীত করছে।

মা তাকে বলল, কে যেতে বলেছিল ঝড়-বৃষ্টিতে ? বৃষ্টিতে ভিজলে ঠান্ডা তো লাগবেই। আমি অল্প গরম জল করে দিচ্ছি, যাও কিছুটা ঠান্ডা জল মিশিয়ে স্নান করে নাও। দেখবে ঠান্ডা আর লাগছে না।

তারপর কোনওদিন বিল্টু আমবাগানে যায়নি এবং কাউকে সেই সাধুবাবাদের কথাও জানায়নি। কিন্তু অনেকবার দেখেছে সেই সাধুবাবাকে তাদের বাড়ি দিয়ে যেতে, সঙ্গে কোনও কোনও সময় তাঁর সাকরেদকে। তাঁরা বাড়ি বাড়ি ভিক্ষে করে বেড়াত।

বিল্টুদের বাড়ির পাশেই ছিল এক স্বর্ণকারের মস্ত বড় দোকান। বিল্টু সেই সোনার দোকানের মালিককে জেঠু বলে ডাকত জেঠুও তাকে খুব ভালোবাসতেন। একদিন সন্ধ্যেবেলা বিল্টু টিউশন পড়ে ফিরছিল। পাড়ার মোড়ের মাথায় এসে সে থমকে দাঁড়াল বিকট বোমা ফাটার শব্দে। মোড়ের মাথায় একটা মন্দির ছিল, সে তার আড়ালে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল।

বাস। এছাড়াও আছে নাকি সজারু। আর তারই মাঝে ছিল পরগাছায় ঢাকা একট পড়ো বাড়ি। সবাই বলে সেখানে নাকি ভূতের বাস। অনেকসময় সেখান থেকে বিকট শব্দ ভেসে আসত। আর রাতের বেলা সেখানে আগুন জ্বলতেও দেখেছে অনেকে। তাই আমবাগানে গেলেও কেউ ওদিকে পা বাড়াত না।

সেবার কালবৈশাখী ঝড় উঠেছে দেখে বিল্টু অন্যদের মতো আমবাগানে আম কুড়োতে ছুটল। কয়েকটা আম কুড়োতে না কুড়োতে ঝড়ের গতি ক্রমশই তীব্রতর হতে থাকল। অনেকেই বাড়ি ফিরে গেল। কিন্তু বিল্টু তখনও আম কুড়িয়েই চলেছে।

ঝড়ের সঙ্গে প্রবল বেগে বৃষ্টি শুরু হল, সঙ্গে বজ্রপাত। চারধার অন্ধকার হয়ে গেছে। বিল্টু কিছু না বুঝতে পেরে নিজেকে বৃষ্টি ও বজ্রপাত থেকে বাঁচাতে সেই পড়ো বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিল। বাড়িটার সামনের দিকটা প্রায় ধ্বংসস্তূপ। ও আরও ভিতরের দিকে প্রবেশ করল। প্রায় দেড়-দু'ঘন্টা এই ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রপাতের দাপট থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে যখন দেখল যে এবার কিছুট স্বাভাবিক হচ্ছে চারদিক, তখন ও সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে গিয়ে শেয়ালের ডাক শুনে একটা দেওয়ালের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে নিল। সে তারপর শুনল ওর পিছন দিক থেকে আরও কয়েকটা শেয়াল একসঙ্গে হুক্কা-হুয়া, হুক্কা-হুয়া করে ডেকে উঠল।

সে আড়াল থেকে সামনে-পিছনে লক্ষ করতে লাগল। এমন সময় লাল সালুতে জড়ানো এক সাধু, মাথায় তাঁর জটা, যা প্রায় তাঁর কোমর অবদি নেমেছে, মুখে লম্বা দাড়ি বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে সেই প্রথম শেয়ালটির মতো ডাক দিতে দিতে তার দিকে এগিয়ে আসছে। সে ভয় পেয়ে গেল। তবু চুপ করে রইল। সাধুটা তার পাশ দিয়ে একটু এগোতেই বিল্টু আড়াল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু পাশের দেওয়াল থেকে একটা ইট খসে পড়ল। আর সাধুবাবা ইট খুলে পড়ার শব্দ পেয়ে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে ফেলল বিল্টুকে। সঙ্গে সঙ্গে সাধুবাবা বলল, কোথাও নড়বি না। খুব সাবধান।

বিল্টু দাঁড়িয়ে পড়ল। সাধুবাবা কাছে এসে বলল, এখানে কী করছিস ? জানিস না এখানে ভূতের বাস। তাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটলে, ঘাড় মুটকিয়ে দেয়।

বিল্টু এবার একটু সাহস নিয়ে বলল, আসলে আম কুড়োতে এসেছিলাম। কিন্তু প্রবল ঝড়-বৃষ্টি -বজ্রপাতের থেকে বাঁচতে এখানে ঢুকে পড়েছিলাম। সাধুবাবা বলল, তুই সত্যি বলছিস ! কিন্তু তোর আম কুড়োনোর থলি কই ?

আসলে দৌড়ে আসতে গিয়ে ওই ওখানে পড়ে গেছে। সাধুবাবা বিল্টুর ইশারা অনুসারে সেদিকে তাকিয়ে দেখল থলেটা পড়ে আছে মাটিতে। যাও গিয়ে থলেটা নিয়ে এসো।

বিল্টু তাড়াতাড়ি থলেটা কুড়িয়ে নিয়ে এসে বলল, আমি কোনও দোষ করিনি। আমাকে বাড়িতে যেতে দিন।

সাধুবাবা হাসিমুখে বলল, ভয় নেই, আয় আমার পিছু পিছু। বিল্টুর মনে ভয় থাকলেও সে সাধুবাবার পিছু পিছু একটা ঘরে গিয়ে প্রবেশ করল। সেখানে আরও কয়েকজন লোক ছিল। তারা সাধুবাবাকে দেখে বলল জয় গুরুদেব !

সাধুবাবা তাদের একজনকে বলল, যাও এই ছেলেটার জন্য ওর থলেটাতে আম ভরে দাও। আর ওকে ওই আমবাগানটা পার করে দিয়ে এসো।

তারপর সাধুবাবা বিল্টুর দিকে তাকিয়ে বলল, যাও বাড়ি চলে যাও, কিন্তু কাউকে এখানে আমাদেরকে দেখেছ বা আমরা যে তোমাকে আম দিয়েছি সে কথা বলবে না। একটু থেমে আবার বলল, এবার থেকে যদি কখনও আম কুড়োতে আসো, তবে কাউকে না জানিয়ে এখানে আমাদের এই ঘরে চলে আসবে, আমরা তোমাকে থলেভর্তি আম দিয়ে দেব।

বিল্টু সাধুবাবাকে বলল, আপনার কোনও চিন্তা নেই, আমি কখনও কাউকে আপনাদের কথা বলব না। মা কালীর দিব্যি !

সে বাড়ি ফিরে এল। থলেভর্তি আম তার মায়ের হাতে দিয়ে বলল, মা খুব শীত করছে।

মা তাকে বলল, কে যেতে বলেছিল ঝড়-বৃষ্টিতে? বৃষ্টিতে ভিজলে ঠান্ডা তো লাগবেই। আমি অল্প গরম জল করে দিচ্ছি, যাও কিছুটা ঠান্ডা জল মিশিয়ে স্নান করে নাও। দেখবে ঠান্ডা আর লাগছে না।

তারপর কোনওদিন বিল্টু আমবাগানে যায়নি এবং কাউকে সেই সাধুবাবাদের কথাও জানায়নি। কিন্তু অনেকবার দেখেছে সেই সাধুবাবাকে তাদের বাড়ি দিয়ে যেতে, সঙ্গে কোনও কোনও সময় তাঁর সাকরেদকে। তাঁরা বাড়ি বাড়ি ভিক্ষে করে বেড়াত।

বিল্টুদের বাড়ির পাশেই ছিল এক স্বর্ণকারের মস্ত বড় দোকান। বিল্টু সেই সোনার দোকানের মালিককে জেঠু বলে ডাকত জেঠুও তাকে খুব ভালোবাসতেন। একদিন সন্ধ্যেবেলা বিল্টু টিউশন পড়ে ফিরছিল। পাড়ার মোড়ের মাথায় এসে সে থমকে দাঁড়াল বিকট বোমা ফাটার শব্দে। মোড়ের মাথায় একটা মন্দির ছিল, সে তার আড়ালে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল।

তারপর সামনের দিকে তাকিয়ে দেখল বেশ কয়েকজন তাদের পাড়ার দিক থেকে মোড়ের দিকে এগিয়ে আসছে। তাদের হাতে অস্ত্র, মুখ ঢাকা কালো কাপড়ে। একজনের পিঠে একটা ভর্তি বস্তা।

কাছে আসতেই সে দেখতে পেল তাদের পরনে লাল রঙের লুঙ্গি, মাথায় লাল ফেট্টি। এদের মধ্যে একজনের মাথায় ফেট্টির আড়াল থেকে কিছুটা জটা বেরিয়ে আছে।

ওরা মোড়ের মাথা পেরিয়ে চলে গেলে, বিল্টু ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। সেই সোনার দোকানের কাছে আসতে না আসতেই সে দেখতে পেল একটা বড় জটলা। কাছে গিয়ে জানতে পারল, ডাকাতরা সোনার দোকান লুট করেছে। সেইসঙ্গে তার জেঠুকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে পেটে বুকে আঘাত করেছে। পাড়ার কয়েকজন তাড়াতাড়ি অ্যাম্বুলেন্স ডেকে বিল্টুর জেঠুকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। অন্যরা পুলিশে খবর দিল।

রাতে পুলিশ এল পাড়ায়। সঙ্গে ভীতুরাম কনস্টেবলও ছিলেন। একে-তাকে এটা-ওটা প্রশ্ন করলেন পুলিশের অনকোয়ারি অফিসার। তারপর তাঁরা চলে গেলেন। ভীতুরাম কনস্টেবলকে বললেন অফিসার, তোমাকে আর আজ যেতে হবে না। দ্যাখো বাড়িতে থেকে আজ আর কোনও খবর বা সন্ধান পাও ওই ডাকাতির ব্যাপারে।

বিল্টু সেদিন রাতে মায়ের হাজার ডাকা সত্ত্বেও খেতে রাজি হল না। শুধু বলল, ওরা জেঠুকে এইভাবে মারল।

ভীতুরাম কনস্টেবল ছেলেকে বলল, তুই এইসব নিয়ে চিন্তা করিস না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

বিল্টু বলল আমি শুতে গেলাম। তারপর নিজের দোতলার ঘরে গিয়ে চুপ করে বসে রইল বিছানায়। অনেক রাতে যখন বুঝল যে বাড়িতে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন সে প্রথম থেকে আবার চিন্তা করতে থাকল সেই আমবাগানের সাধুবাবা ও তাঁর সাকরেদদের কথা। তারপর আজকের ঘটনা। অনেক রাতে একটা চিরকুটে কী যেন লিখে, বাবা-মায়ের ঘরে গিয়ে টেবিলের ওপর রেখে বাবার ঘড়িটা চাপিয়ে বেরিয়ে এসে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে বিল্টুর স্কুল নেই। রবিবার, তাই ওর মা বিল্টুর ঘুম ভাঙাল না। বিল্টুর বাবা প্রাতঃকর্ম শেষ করে জলখাবার খেয়ে ডিউটিতে যাওয়ার আগে ঘড়িটা হাতে তুলতে গিয়ে দেখল, তার নীচে একটা চিরকুট, তার ওপরে লেখা "আর্জেন্ট বাবা"।

থানায় পৌঁছে ভীতুরাম সোজা ঢুকে গেল সেই এনক্যোয়ারি অফিসারের ঘরে। গিয়ে দেখল তিনি তখনও থানায় আসেননি। বেরিয়ে এসে সে অপেক্ষা করতে থাকল থানার মেন গেটের সামনে।

বেলা প্রায় বারোটার সময় অনক্যোয়ারি অফিসারকে থানায় ঢুকতে দেখে সামনে গিয়ে দাঁড়াল ভীতুরাম। অফিসার তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে! কোনও খবর আছে নাকি ?

ভীতুরাম বললেন, স্যার অফিসে চলুন। তারপর ভীতুরাম পকেট থেকে সেই চিরকুটটা বের করে অফিসারের হাতে দিলেন। তারপর....

পাড়ায় দুপুর দেড়টার সময় দু'ভ্যান পুলিশ, অনক্যোয়ারি অফিসার, সাব-ইনস্পেক্টর, অফিসার ইনচার্জ আর বেশ কিছু অফিসার, সঙ্গে ভীতুরামকে দেখা গেল। তাঁরা আগে থেকেই অ্যাকশন প্ল্যান ছকে নিয়েছিলেন। ভীতুরামকে ডেকে অফিসার ইনচার্জ বললেন, তোমার ছেলেকে আমাদের কাছে আসতে বলো।

বিল্টুকে ভীতুরাম অফিসার ইনচার্জের সামনে নিয়ে এলেন। অফিসার বললেন, বাবা, বলো তো তুমি কী জানো।

বিল্টু বলল, ওরা যদি জেঠুকে আঘাত না করত তাহলে হয়তো কিছুই জানতাম না। কিন্তু ওদের কথা আমি আগেই জানতাম। কিন্তু কোনও দিন কিছু চোখে পড়েনি বা ওদের কুকীর্তি শুনিনি। তারপর বলল, স্যার চলুন ওদের আড্ডায় নিয়ে চলি।

আমবাগানে প্রবেশ করে সেই পড়ো বাড়িটাকে চারধার থেকে ঘিরল পুলিশ। এরপর বিল্টুকে ফিসফিস করে বলল, তুমি তোমার থলেটা নিয়ে ওদের সেই ঘরে প্রবেশ করো। তোমার কোনও ভয় নেই।

বিল্টু আস্তে আস্তে এগিয়ে ঘরের দরজায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ইশারায় পুলিশ অফিসারকে আসতে বলল। পুলিশ অফিসার বিল্টুর কাছে আসতেই অবাক হয়ে গেল। ছয় জন মানুষ এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে শুয়ে আছে। মাঝখানে তাদের সামনে এঁটো খাবারের থালা, গ্লাস। ওদেরকে অ্যারেস্ট করল পুলিশ বাহিনী। যাবতীয় ডাকাতির মালপত্র বাজেয়াপ্ত করা হল।

পরে পুলিশ সূত্রে জানা যায় সাধুবাবা ওরফে বংশীলাল আসলে বিহার থেকে এসে আগে নদিয়ায় ঘাঁটি গাড়ে। পরে এখানে।

বংশীলাল সব দোষ স্বীকার করে এবং বলে যে আসলে আজকের দিনটা পার করতে পারলেই কাল তারা বিহারে পালিয়ে যেত। কিন্তু বিল্টু ও তার বাবার জন্যই তারা এই কাজে সফল হতে পারল না। পুলিশের তরফে ভীতুরাম ও তাঁর ছেলেকে পুরস্কৃত করা হল। অফিসার ইনচার্জ ভীতুরামকে আর কেউ ভীতুরাম বলে ডাকবে না বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

রহস্য গল্প

# চাবুকের দাগ

## দেবদুলাল কুন্ডু

প্রায় আটবছর হতে চলল নৈহাটি-ব্যান্ডেল সেকশানে জুবিলিব্রিজের প্যারালালে নতুন একটা রেলব্রিজ তৈরি হচ্ছে হুগলিনদীর উপর। হুগলি জেলায় গঙ্গাকে হুগলিনদী বলা হয়। জুবিলিব্রিজটা ইংরেজ আমলে তৈরি, অনেক আগেই একশো বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এই ব্রিজের বয়স। ব্রিজের লঙজিবিটির মেয়াদ অতিক্রান্ত । একটা ব্রিজ তৈরি মানে সে এক বিশাল কর্মযজ্ঞ। লোকলস্কর-যন্ত্রপাতি-ক্রেন-লঞ্চ প্রভৃতি নানা জিনিসের সমাহার।

গঙ্গার একপাশে গরিফা আর এক পাশে হুগলিঘাট এই দুই স্টশনকে জুড়ে ছে ব্রিজটি।

কয়েকমাস হল অচিন্ত্য বড়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে জয়েন করেছে এই ব্রিজ তৈরির কোম্পানিতে। অচিন্ত্য চাকরিতে এসেছে বছর পাঁচেক, এর আগে অন্য একটা কোম্পানিতে ছিল। এদের স্যালারি আর সুযোগ-সুবিধে অনেক বেশি বলেই এখানে যোগদান করেছে। ওর উপরের বস ওকে ওর কাজ বুঝিয়ে দিয়েছে। প্রায় কুড়িজন লেবার আর একজন ম্যানেজার ওর আন্ডারে আছে। অচিন্ত্য ওদের শুধু জাংশানের টুকরো আর সেগুলোর মেজারমেন্ট অঙ্ক কষে বের করে দেয়। ম্যানেজার সেগুলো ওয়েল্ডিং করে লেবারদের নিয়ে। ওরা একটা পোরশান তৈরি করছে মাত্র; ওদের মত আরো ছোটছোট দল আছে, সকলের টুকরো টুকরো কাজ মিলিয়েই ব্রিজটা সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে। নদীর দু'ধারে তাঁবু টাঙিয়ে সকলে থাকে। তবে লেবার ার ইঞ্জিনিয়ারদের তাঁবুর মধ্যে পার্থক্য আছে।

মাঝরাতে অচিন্ত্যর ঘুম ভেঙে গেল। গতরাতের খাওয়াটা একটু বেশি রিচ হয়ে গিয়েছিল, পেটটা মোচড় দিল তার। মোবাইলে দেখে নিল রাত তিনটে বাজে। অচিন্ত্য গামছাটা পরে নিয়ে নদীর পারে টয়লেটে ছুটল।

শরৎকাল, স্বাভাবিক ভাবেই বাতাসে হালকা শীতের পেলবতা। কিন্তু ওয়েদর বেশ আরামদায়ক। নদীর কূল থেকে কলকল শব্দ ভেসে আসছে। এটা নদীর চিরকালের সঙ্গীত। অচিন্ত্যর বাড়ি কলকাতায়। এর আগের চাকরিতে ঝাড়খন্ডে ছিল, এবার হুগলিতে। বেশ উপভোগ করছে দিনগুলো সে। এই আশ্বিনেই সে ত্রিশে পা রাখবে। বাড়ি থেকে বিয়ের তোড়জোড় শুরু করেছে। অচিন্ত্য গুনগুনিয়ে ওঠে- "এমনি মধুর রাতে মোর পিয়া.."। হঠাৎ যেন কার চিৎকারে সম্বিৎ ফিরে পায়, বেশ মধুর স্বরে কে যেন ডেকে উঠল। অচিন্ত্য এদিক ওদিক তাকাল, না কেউ তো এখনো তাঁবু থেকে ওঠেনি। টয়লেট আর জলের কল থেকে তাঁবু অন্ততঃ একশগজ দূরে অবস্থিত। অচিন্ত্যরা যেখানে তাঁবু পেতেছে তার চারপাশের গোটা অঞ্চলটা সার্চলাইটে আলোকিত। নদীর পাড় অবধি আলোর পোল বসানো হয়েছে।

দ্বিতীয়বার একটু জোরেই যেন চিৎকারটা ভেসে এল ওর কানে। এবারে ও কান

খাড়া করে শুনল, আওয়াজটা আসছে নদীর দিক থেকে। অচিন্ত্য পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল নদীর দিকে। পাশেই রামঘাট ফেরিসার্ভিস, তার পাশে একটা স্নানঘাট। পুরো ঘাট আলোকিত। অচিন্ত্য সেই স্নানঘাটের দিকে এগিয়ে গেল। এখন ভাটির সময়। ও দেখল এক যুবতি নারী ঘাটে নেমে স্নান করছে, ওকে দেখে মধুর সুরে গান ধরল সেই যুবতি।

"কে তুমি ? এত রাতে স্নান করতে নেমেছ কেন ?" অচিন্ত্য জিজ্ঞেস করল।

মেয়েটি নিরুত্তর, শুধু হাসল মাত্র। তারপর মৃদু হেসে অচিন্ত্যের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল, মাথা নেড়ে ওকে ডাকল। মুহূর্তে অচিন্ত্য ভুলে গেল স্থানকাল। ও জলে নেমে পড়ল। ওর পায়ের ফাঁকে সুড়সুড়ি দিল মাছের ঝাঁক, ও হাঁটু জলে নামল। মেয়েটি নেমে গেল আরো গভীর জলে, অচিন্ত্যও এগিয়ে গেল। হঠাৎ অদূরের ইমামবাড়ির মসজিদ থেকে ভেসে এল ভোরের নমাজ। সম্বিৎ ফিরে পেল অচিন্ত্য। সেই নারীমূর্তি খল খল করে হাসতে হাসতে মিলিয়ে গেল জলে। অচিন্ত্য কোনরকমে পাড়ে উঠল। তারপরে আর কিছু মনে নেই ওর।

(২)

"এ কী ! স্যার এত সকালে আপনি ঘাটে এভাবে পড়ে রয়েছেন ! ?" ম্যানেজারের ধাক্কায় জ্ঞান ফিরে পেল অচিন্ত্য। অচিন্ত্য উঠে বসল, সবে তখন পূর্বদিক রাঙিয়ে সূর্য উঠছে। অচিন্ত্য দু'হাতে চোখ ডলে তাকাল ম্যানেজারের দিকে। তারপর মনে পড়ে গেল গতরাতের কথা। খুব লজ্জায় পড়ে গেল সে, ম্যানেজার তার সম্পর্কে কী ভাবল কে জানে ?

"ভোরবেলা টয়লেট করতে এদিকটায় এসেছিলাম, তারপর মাথাটা ঘুরে.." অচিন্ত্য বলল।

"চলুন। আজকে একবার ডাক্তার দেখিয়ে নেবেন।"

সে গতকালের মেয়েটির কথা কিছুতেই খুলে বলল না। তাহলে এরা ভাববে সে নেশার ঘোরে কী দেখতে কী দেখেছে ! তাঁবুতে ফিরে গরম চায়ের কাপে আয়েসে চুমুক দিয়ে একটু গড়িয়ে নিল। কিছুক্ষণের মধ্যে তার দু'চোখ জুড়ে ঘুম নামল। ঘুম ভাঙল ম্যানেজারের ডাকে। সে দেখল ম্যানেজার কোম্পানীর ডাক্তার নিয়ে হাজির। অচিন্ত্য মোবাইলে দেখে নিল সকাল দশটা বাজে। ডাক্তারবাবু প্রেশার মাপল, নাড়ি দেখল, জিভ ও চোখের মণি পরীক্ষা করে বলল, কিছুই হয়নি, স্নায়বিক দুর্বলতা আর রাত্রি জাগরণ থেকে এটা হয়েছে। একটা দিন রেস্ট নিলে ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু অচিন্ত্য কিছুতেই রেস্ট নিতে রাজি নয়, সে স্নান-খাওয়া সেরে সাইটে চলে গেল, কিন্তু কিছুতেই কাজে মন বসাতে পারল না। বারবার গত রাতের ছবি ভেসে উঠছে তার মানসপটে।

(৩)

রাত কত হবে কে জানে ? নূপুরের মৃদু শব্দে ঘুম ভেঙে গেল অচিন্ত্যর। কে যেন নূপুর পায়ে তাঁবুর চারপাশে হাঁটছে। সে ভয় পেল না, বরং কৌতূহলী হয়ে তাঁবুটা সামান্য ফাঁক করল। শব্দটা থেমে গেল। বাইরে সারি সারি তাঁবু জোছনায় ডুবে আছে। তাহলে কি মনের ভুল ? ক্যাম্পখাটে উঠে এল সে। আবার আরম্ভ হল নূপুরের শব্দ। এবারে আগের থেকে স্পষ্ট। চটিটা পায়ে গলিয়ে নিয়ে সে বাইরে বেরিয়ে এল। প্রথমে কিছুই তার নজরে এল না। পিছন ফিরেই চমকে গেল সে, গতকালের সেই যুবতী ঠিক তার পেছনেই দাঁড়িয়ে। তার সারা গায়ে বহুমূল্য গহনা। যুবতীকে গতকালের চেয়ে আরো সুন্দরী লাগছে। তার ঠোঁটে লেগে আছে সেই মোহময় হাসি। যুবতী তার দিকে মুখ করে ক্রমশঃ পিছোতে লাগল আর ইশারায় তাকে ডাকল। চুম্বকের মত অমোঘ আকর্ষণে অচিন্ত্য অনুসরণ করলেন যুবতীকে।

কতক্ষণ অনুসরণ করেছে সেদিকে খেয়াল নেই অচিন্ত্যর। সুন্দরী নারীটি এখনো মোহময়ী রূপে চলেছে তার সামনে সামনে। ইতিমধ্যে পেরিয়ে এসেছে জোড়াঘাট আর শ্যামবাবুর ঘাট। শ্যামবাবু ঘাটের পরেই ভুবন সোমের ঘাট। ঘাটের পাশেই একটা পোড়োবাড়ি। বটের চারা আর আগাছায় চেপে ধরেছে পলেস্তরা খসা জীর্ণ এই বাড়িটাকে। যুবতী এই পোড়োবাড়িটার দরজার সামনে পৌঁছে যেন মিলিয়ে গেল। অচিন্ত্য নেশাগ্রস্তের মত যুবতীকে অনুসরণ করে বাড়িটার ভেতরে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে চারপাশের ঝাড়বাতিগুলো দপ্ করে জ্বলে উঠল। ঘরের চারপাশের ডেকরেশান গেল পাল্টে। ঘরের মাঝখানে আলপনা আঁকা, তারপাশে ফরাস পাতা। একপাশে বাঁয়া-তবলা-হারমোনিয়াম আর তানপুরা। আরেকদিকে সারি সারি পানপাত্র সাজানো। তার মনে হল এটা নাচঘর।

হঠাৎ পাশের ঘর থেকে ফিসফাস আওয়াজ কানে এল তার। অচিন্ত্য পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। তারপর দরজার ফাঁকে চোখ রাখল। আরে এইতো সেই মোহময়ী নারী, যাকে অনুসরণ করে ওর এখানে আসা। মেয়েটি একজন মাঝবয়সী লোকের সঙ্গে কথা বলছে। সে দরজায় কান পাতল। ও পরিষ্কার শুনল লোকটি বলছে, "এত রাতে কোথায় গিয়েছিলে ? আবার শুরু করেছে ধিঙ্গিপনা ?"

"সব প্রশ্নের কৈফিয়ৎ আমি দিতে পারব না" মেয়েটি উত্তর দিল।

"অবশ্যই কৈফিয়ৎ দিতে হবে, এটা আমার আদেশ"

"পারব না, তোমার যা খুশি করতে পার...।"

"তবে রে... চাব্‌কে চামড়া তুলে নেব।" এই বলে লোকটি দেওয়ালে টাঙানো চাবুকটা হাতে তুলে নিল, তারপর সপাং শব্দে সেটা দিয়ে আঘাত করল মেয়েটির গায়ে। মেয়েটি আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। অচিন্ত্য আর থাকতে পারল না, চাবুকের দ্বিতীয় আঘাত নেমে আসার আগেই সে চিৎকার করে উঠল,"আপনি কী করছেন ?"

"কে ?" পিছন ফিরে লোকটা অচিন্ত্যকে দেখে চোখমুখ লাল করে বলল, "আমাদের কথার ভেতরে আপনি নাক গলাচ্ছেন কেন মশাই ?"

"আপনি ওকে মারতে পারেন না।"

"তাহলে মারটা ওর বদলে আপনিই খান।" এই বলে লোকটি চাবুক দিয়ে সপাং শব্দে সজোরে আঘাত করল অচিন্ত্যর পিঠে। যন্ত্রনায় কুকড়ে গেল অচিন্ত্যর শরীর। জ্ঞান হারানোর আগে একজোড়া নরনারীর আকাশকাঁপানো হাসির শব্দ শুনতে পেল সে।

(৪)

"স্যার উঠুন, এখানে কী করছেন আপনি ?" ম্যানেজারের প্রবল ঝাঁকুনিতে জ্ঞান ফিরে এল অচিন্ত্যর।

"আ-আ- আমি কোথায় ?" জড়ানো গলায় জিজ্ঞেস করল সে। "আপনি ভুবন সোমের ঘাটের পোড়ো বাড়ির মেঝেতে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে রয়েছেন।" ম্যানেজার বলল। অচিন্ত্য দেখল ম্যানেজারের সঙ্গে বেশ কয়েকজন লেবারও আছে। অচিন্ত্য লজ্জা পেল, সকলে তার সম্পর্কে কী ভাবছে কে জানে ? কয়েকজন ধরা ধরি করে অচিন্ত্যকে বাইরে নিয়ে এল। তখন সকাল দশটা বাজে। নদীতে ফেরি সার্ভিস চালু হয়েছে। ঘাটে নিত্যযাত্রীদের ভিড় বাড়ছে।

"সকালে তাঁবুতে আপনাকে না পেয়ে এদিক ওদিক খুঁজি। তারপর এদেরকে নিয়েই নদীর পাড় বরাবর হাঁটতে থাকি। শেষে এই পোড়োবাড়ি থেকে গোঙানির শব্দ পেয়ে ভেতরে ঢুকে আপনাকে আবিষ্কার করি।" ম্যানেজার বলল।

"তোমাকে ধন্যবাদ দেবার ভাষা নেই। তোমরা না এলে আমি হয়ত মরেই পড়ে থাকতাম। "

ঘাটের পাশে একটা সাইকেল গ্যারেজ আর একটা চায়ের দোকান। সকলে মিলে অচিন্ত্যকে চায়ের দোকানে এনে বসালো। অচিন্ত্য সকলের জন্য চায়ের অর্ডার দিয়ে চোখেমুখে জল দিল। তারপর খুলে বলল গতরাতের সমস্ত ঘটনা।

"বাপমায়ের আশীর্বাদে আপনি জোর বাঁচা বেঁচে গিয়েছেন।" মুখ খুলল বৃদ্ধ দোকানদার।

"ঐ বাড়ির কোন ইতিহাস আছে নাকি ?" ম্যানেজার জিজ্ঞেস করল।

"ইতিহাস মানে, এটা রীতিমত ভূতুড়ে বাড়ি। এর আগেও এনার মত বেশ কয়েকজন যুবক ওখানে বেঘোরে প্রাণ দিয়েছে। এই ঘাটের কাদার মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে মরে পড়ে থাকতে দেখা গেছে অনেককে।"

"বাড়িটার ইতিহাস একটু বলুন আমাদের।" চায়ে চুমুক দিয়ে অচিন্ত্য বলল।

"সে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগের কথা। এই পোড়োবাড়িটা ছিল ভুবন সোমের বাগান বাড়ি। এখানে অমলা নামে এক বাঈজীকে রেখেছিল। ভুবন সোমের অনুপস্থিতিতে ঐ বাড়িতে উঠতি যুবকেরা ভিড় জমাতো। অমলাও ওদের প্রশয় দিত। ভুবন অমলার উপর শুরু করল অত্যাচার। শেষে একদিন জোয়ারের সময় অমলার মৃতদেহ ভেসে উঠল ওপারে মেছুয়াবাজার ঘাটে। এর দু'দিন পরে ঘরের সিলিং-এ ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গেল ভুবনের মৃতদেহ। সেই থেকে রাতে ওবাড়ি থেকে বিচিত্র আওয়াজ ও কান্নার শব্দ শোনা যেত, আর আপনার মত বেশ কয়েকজন শিকার হয়েছিল ওদের।"

"ভুবন সোমের ছেলেমেয়েরা এই বাড়িটার কোন ব্যবস্থা নিল না কেন ?" অচিন্ত্য বলল।

"ভুবন সোম ছিল অকৃতদার। তার ভাইয়ের ছেলেরা আমেরিকা না কোথায় থাকে। বুঝতেই তো পারছেন শরিকি সম্পত্তি। সরকার থেকেও দায়িত্ব নিতে চাইছে না।"

"এর আগে ভূত-প্রেতে আমার বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু পিঠে অসহ্য যন্ত্রণা ।" অচিন্ত্য টি-শার্ট খুলল, সকলে অবাক হয়ে দেখল ওর পিঠে লম্বালম্বি ভাবে জ্বলজ্বল করছে চাবুকের দগদগে লাল দাগ।

## রূপকথার দেশে

### নুরজামান শাহ

জানি নাকো কিছু আমি ভালোবাসি খেলা,
ইচ্ছে করে দিগন্তে ছুঁই লালচে বিকেলবেলা।
রূপকথাদের ঘরবাড়ি সব সেথায় নাকি আছে,
আকাশে চোখ মেললে নাকি যায় দেখা খুব কাছে।
মেঘে গড়া পক্ষীঘোড়া যাচ্ছে ভেসে ভেসে,
পাহাড় ঘেঁষে সাগর ছুঁয়ে অচিন কোনো দেশে।
কত দিন রাত স্বপ্নে দেখি রাক্ষসবধ করে,
রাজপুত্তুর হয়ে আমি ফিরছি নিজের ঘরে।
মা বলছে, খোকা আমার মস্ত বড় বীর–
ইচ্ছে জুড়ে আজও করে মনের কোণে ভীড়।

গল্প

# বিনিদের নতুন বাড়ি

## সমাজ বসু

বিনিদের একটা নতুন বাড়ি হচ্ছে। এখন ওরা যে বাড়িটায় থাকে, সেখান থেকে দশ মিনিটের হাঁটা পথ। বিনি, ইস্কুলে আসা যাওয়ার পথে এই নতুন বাড়িটা প্রায়ই দেখতে যায়। মা বাবা সঙ্গে থাকলে সে আর নতুন বাড়িতে ঢোকার কথা বলতে সাহস পায় না। কারণ, তাঁরা তাকে বুঝিয়েছে, নতুন বাড়িতে এখন ইট, কাঠ, পেরেক সব চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। এখন সেখানে যাওয়া মানেই বিপদ। কিন্তু ছোটকার সঙ্গে নতুন বাড়িতে গিয়েবিনির বেশ ভালই লাগে। চারজন মিস্ত্রি সব সময় কাজ করেই যাচ্ছে। তারাই বিনিকে বলেছে, কোনটা শোবার ঘর, কোনটা বারান্দা আর কোনটা বাথরুম। ছোটকা ড্রইংরুমটা দেখাতেই বিনি ঠিক করে ফেলল, ওর পড়ার টেবিলটা কোথায় থাকবে। ছোটকা বিনির সব কথা মন দিয়ে শোনে, তাই ছোটকাকেই ওর খুব পছন্দ। ইস্কুলের দরজায় পৌঁছেই সে রোজ মাকে বলে দেয়, ছোটকা যেন তাকে নিতে আসে।

সেদিন ইস্কুল ছুটির পর ছোটকার সঙ্গে নতুন বাড়িতে গিয়ে বিনিতো একেবারে অবাক। এর মধ্যেই দরজা জানলা লাগানো হয়ে গেছে।

—আমরা কবে আসবো ছোটকা ? বিনির প্রশ্ন শুনে একটা কাকু (মিস্ত্রিদের বিনি এই নামে ডাকে) মুড়ি খেতে খেতে বলল, —

—এই তো, আর দশ বারো দিনের মধ্যেই তোমার চলে আসবে। তিনদিনের ভেতর রং হয়ে যাবে, তারপর জল,লাইট আর ফ্যান লাগলেই ব্যাস, বাড়ি তৈরি।

—আচ্ছা তোমরা মুড়ি খাচ্ছো কেন ? ভাত খাবে না ? বিনির কৌতুহল জাগে।

—আমরা খুব সকালে বাড়ি থেকে ভাত খেয়ে বেরোই, আবার সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি ফিরে ভাত খাই। তাই এই সময় আমরা মুড়ি আর চা খাই। বিনির একজন কাকু হাসতে হাসতে বলল।

কিছুক্ষণ ছোটকার সঙ্গে নতুন বাড়িতে কাটানোর পর বিনি বাড়ির দিকে পা বাড়ায়।

—আচ্ছা ছোটকা, ওই কাকুরা আমাদের জন্য এত সুন্দর বাড়ি বানিয়ে দিচ্ছে, তাহলে ওদের বাড়িগুলোও নিশ্চয়ই খুব সুন্দর তাই না ?

—না রে, ওদের কারো সুন্দর বাড়ি নেই। একটা ছোট্ট ঘরে ওরা একসঙ্গে থাকে।

ছোটকার কথা শুনে বিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে — এত খেটে অপরের জন্য বাড়ি বানিয়ে ওদের কী লাভ ?

—তাহলে শোন্, ওরা যত ভাল আর সুন্দর বাড়ি বানাতে পারবে, সবাই বাড়ি বানানোর জন্য ওদেরই ডাকবে। তখন ওরা অনেক টাকা পাবে, আর সেই টাকা ওরা নিজেদের ছেলেমেয়ের জন্য দেশে পাঠিয়ে দেবে। এখন তাড়াতাড়ি বাড়ি চল, আমাকে অফিস যেতে হবে।

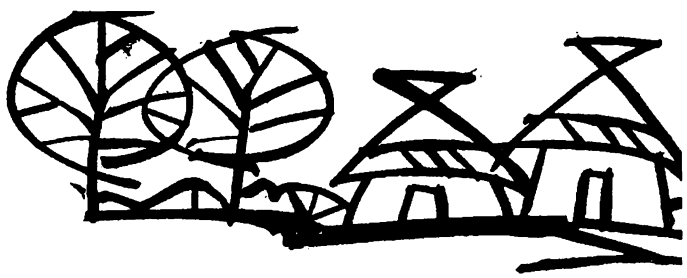

বিনি তারপর ছোটকার চলার সঙ্গে তাল মেলাতে থাকে।

সকাল থেকেই আজ বিনিদের নতুন বাড়িতে আত্মীয় স্বজনের ভীড়। বিনি মায়ের মুখে শুনেছে, আজ নাকি গৃহপ্রবেশ। নতুন বাড়িতে বাস করতে গেলে নারায়ণ ঠাকুরের পুজো করে নিতে হয়। সবাইকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াতে হয়। সবাই ভীষণ ব্যস্ত। বিনি তো মাকে এক মুহূর্তের জন্যও কাছে পাচ্ছে না।

—বিনি, ছোটকার কানে কানে কী বললে ? তোমাকে বলেছিনা, সবার সামনে কানে কানে কথা বলতে নেই।

বিনি মায়ের ছোট্ট শাসন শুনে শুধু বলল, ভুল হয়ে গেছে মা, আর হবে না।

ছোটকাকে ছাড়া বিনি আজ কিছুতেই খাবে না। বিনির জেদের কাছে সবাইকে হার মানতে হল।

হঠাৎ বিনি আনন্দে চিৎকার করে উঠল, মা দ্যাখো, কাকুরা এসে গেছে। আমিই ছোটকাকে ওদের ডেকে আনতে বলেছি। এই চারজন কাকু কত কষ্ট করে, যত্ন করে আমাদের বাড়িটা বানিয়ে দিল, ওরা না এল কি ভাল লাগে ? আজ এমন আনন্দের দিনে কাকুরাও আমাদের সঙ্গে পেট ভরে খাবে। খুব মজা হবে, তাই না মা ?

মেয়ের কথা শুনে, তাকে জড়িয়ে ধরে বিনির মা শুধু বলল, তুমি খুব ভাল আর অনেক বড় কাজ করেছো বিনি। এবার চলো, আমরা সবাই একসঙ্গে বসে খেয়ে নিই।

তারপর বিনি ওর কাকুদের সবাইকে খাবার টেবিলে ডেকে নিল। আর ছোটকা তার মোবাইলে ছবি তুলতে লাগল।

## রোগীর ভয়

### রাজীব মিত্র

রোগী দেখে ডাক্তার সাব দিলেন অভিমত,
"ফল আর জল পথ্য শুধু এ ছাড়া নেই পথ।
যে ফল প্রিয় সেটাই খাবেন না ছাড়িয়ে খোলা
ওষুধপত্র আজ থেকে থাক না হয় শিকেয় তোলা।
সঠিক ভাবে মেনে চলবেন আমার ে নির্দেশ
নইলে সিওর দফা রফা শরীর হবে শেষ।"
শুনে রোগী বললে, "তবে গেলাম বুঝি মরে,
নারকেল যে প্রিয় আমার খাবো কেমন করে ?"

## মাছ ধরে নন্দ

### সলিল মিত্র

খালে বিলে ঘুরে ঘুরে মাছ ধরে নন্দ
জল কাদা মাখা গায়ে বড়ো মেছো গন্ধ।
দুকুরে সে এসে পড়ে কোলেদের পুকুরে,
ভয়- পাছে তাড়া করে এ-পাড়ার কুকুরে।
চ্যাং চুনো ল্যাটা পুঁটি পারছে যা ধরছে
খালুইয়ের হাঁ-মুখেতে গুনে গুনে পুরছে।
কাদা জল ঘেঁটে চুনো পুঁটি ক'টা উঠল
সে হিসেব করে নিয়ে বাজারেতে ছুটলো।
বাজারেতে মাছ বেচে ঘরে ফিরে যাবে সে-
তবেই না চাল আলু তেল নুন পাবে সে।

## সোনা রোদের মিছিল

### সুচন্দ্রনাথ দাস

আর ব'সে নয় হতাশাতে কান্নাকাটি মেখে,
দারুণ শীতে দিন যাবে না আগুনে হাত সেঁকে।
যে নিয়মে সবার বাঁচা, সেই নিয়মই চাই
সবার জন্য স্বাস্থ্য-শিক্ষা, সাম্যের গান গাই।

ফুটপাতে কেউ থাকবে না আর, সবার নিজের বাড়ি,
সবার জন্য জাতীয় কাজ, চড়বে সবাই গাড়ি।
সোনা রোদের মিছিল নিয়ে ঘুরব দেশে দেশে,
দুঃখ ব্যথা সইব সবাই জীবন ভালোবেসে।

দেশের বুকে সবার আছে সমান অধিকার,
পদতলে নত হয়ে থাকবে না কেউ আর।
অন্ধ আইন চূর্ণ ক'রে বলিষ্ঠ দুই করে...
রোদের মিছিল পৌঁছে দিতে হবে ঘরে ঘরে।

## রাস্তা ফাঁকা

### সলিলরঞ্জন দাশগুপ্ত

টগবগ টগবগ আওয়াজ তুলে এক্কা গাড়ি ছোটে,
করিম মিঞার হাতের চাবুক পিঠেতে তার জোটে।
এক নাগাড়ে ছোটে ঘোড়া চোখ দুটো তার ঢাকা,
দেহে যখন চাবুক পড়ে বোঝে রাস্তা ফাঁকা।

## শরত এসে

**শেখ গোলাম মাবুদ**

বর্ষা শেষে নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা
দব্‌বো ঘাসে শিশির ভাসে সকাল সন্ধেবেলা।
শিউলি ঝরে মাটির পরে কাশ ফুলেরাও মাতে
পদ্ম সাজে দিঘির মাঝে শরত ঋতুর সাথে।
পুজোর গন্ধে মাতি আনন্দে আগমনির সুর
সকাল সাঁঝে মাদল বাজে তাক-কুড়া-কুড়-কুড়।

## আগমনি

**স্বপন বসু মল্লিক**

হিমেল হাওয়া কাশের দোলা
শিউলি ফোটা ক্ষণ,
পুজোর গন্ধ বাতাস জুড়ে
মাতায় সবার মন।
পদ্ম-শালুক নীলচে আকাশ
সোনা রোদের হাসি
সবুজ ঘাসের পাতায় পাতায়
শিশির ঝরা রাশি
মা যে আসেন সবার মাঝে
নতুন সাজে সেজে
মন্দিরেতে কাঁসের ঘন্টা
উঠল ওই বেজে।


সঞ্চিতা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে

**পুরুলিয়ার ছড়া**

(পুরুলিয়ার ছড়াকারদের নির্বাচিত ছড়া)

**পুরুলিয়ার গল্প**

(জেলার গল্পকারদের লেখা ছোটদের জন্য নির্বাচিত গল্প সংকলন)

সম্পাদনাঃ তরুণ কুমার সরখেল


## বদলে যাবে পরিবেশ

**তাপস চক্রবর্তী**

ছোট্ট বন্ধুরা শোন সবাই পরিবেশকে সুস্থ রাখা চাই
তোমাদের হাত ধরেই যেন এ কাজ করে সবাই।
দেখবে কেমন ফুল ও ফলে ভরবে চারিধার,
আসবে কত পাখ-পাখালি কাটবে মনের ভার।
বদলে যাবে পরিবেশটা ফুটবে মুখে হাসি,
গাছ বলবে ছোট্ট বন্ধু তোমায় ভালোবাসি।

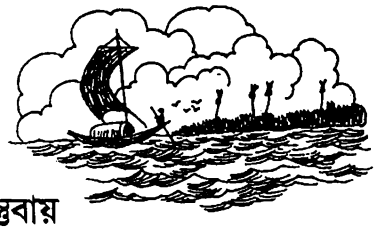

## ইচ্ছে ডানা

**নয়নতারা তন্তুবায়**

ইচ্ছে ডানায় ভর দিয়ে মন যায় চলে যায় কোন দেশে
হাওয়ায় ভেসে ফুল পরিরা যায় চলে যায় নবীন বেশে।
ইচ্ছে ডানার নদী গুলো স্রোতের মুখে চলছে বেশ
ঢেউ-এর গতি কেউ কি জানে থামার কোথায় আছে রেশ।
তবুও বলি ইচ্ছেগুলোই দেয় ঢেলে দেয় সোনালি রোদ
মিষ্টি খুশির জানলা খুলে দেখরে চেয়ে আপন-খোদ।

## গয়ারাম পালোয়ান

**ব্রজেন্দ্রনাথ ধর**

গয়ারাম পালোয়ান কী খান জানো কি ?
বুড়োরাও ভয় পায় মানুষ না দানো কী !
হাঁটলেই মাটি কাঁপে কুকুরেরা চিল্লায়
বসলেই ভুড়ি কাঁপে বা কীরে পেল্লায়।
চেহারা এমন তার পাঁচখানা হস্তি
এক হাতে তুলে নিয়ে করে খুব মস্তি।
তালগাছ দিয়ে সে বাঁ কান চুলকায়
আলু ও টমেটো নয় বৃক্ষের মূল খায়।
গয়ারাম পালোয়ান গুনি ছিল মস্ত,
শিষ্য ছিলাম তার সোজা তিন প্রস্থ।
তবু আমি প্যাকাটি কপালটা মন্দ
পালোয়ান বিদ্যায় বেঁধেছিল দ্বন্দ্ব।

## মিষ্টি রোদ শান্ত ছায়া

**চৈতালি মজুমদার**

যাচ্ছে রোদ থাকছে ছায়া
এই যে হাসি খুশির মায়া।
গাছের পাতা কেমন নড়ে
কাঠবেড়ালি লাফিয়ে পড়ে।
যাচ্ছে রাজহাঁসের দল
লেকের মধ্যে অনেক জল।
সবুজ ঘাসে চড়ুই পাখি
যাচ্ছে দেখা , খাচ্ছেটা কী ?
সকাল ন'টা কাঁটায় কাঁটায়
শালিকগুলো গলা ফাটায়।
কীসের জন্য ঝগড়া করে,
একটু পরেই যাবে উড়ে।
লেকের জলে আলোর কণা,
দিচ্ছে ঢেউ যাচ্ছে গোনা।
রাস্তা এখন অন্যমনে
ভীড় এড়ানোর প্রহর গোনে।
শান্ত পায়ে দুপুর আসে
মিষ্টি রোদ তখন হাসে।

## অমনি খুড়ো

**স্নেহাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়**

মুখে খুড়ো কয়না কথা
শুধুই দু'হাত নাড়ে,
পাড়ার লোকে বলছে খুড়োর
ভূত চেপেছে ঘাড়ে।
কেউ বা বলে পায়নি ভূতে
খুড়োর ওটা রোগ,
দেখছে সবাই দু'চোখ মেলে
করছে উপভোগ।
বাড়ির লোকে যেই বলেছে
ডাকতে হবে ওঝা,
অমনি খুড়ো ছুটতে থাকে
শ্মশান ঘাটে সোজা !

## বকুল দিদি

**স্বপনকুমার বিজলী**

বকুল দিদির স্কুলে তখন পড়ি
ছাত্র ছিল দশ বারো জন মোটে
পাঁচখানা যেই ঘন্টা মারে ঘড়ি
পড়ি মরি সবাই এসে জোটে।
আটচালাতে মাদুর পাতা থাকে
সন্ধে হলে হ্যারিকেনের আলো
কদম গাছে হুতুম প্যাঁচা ডাকে
সবাই বলে দিদি পড়ায় ভালো।
হাত ধরে তার বাংলাতে পাঁচ লেখা
সহজ পাঠের কত মজার ছড়া
নামতা গুলো তার কাছেতে শেখা
আরও কত হরেক রকম পড়া।
একে একে সবার পড়া হলে
গল্প হাসি হত সবার শেষে
দলে দলে সবাই চলে গেলে
দিদি ঘরে পৌঁছে দিত এসে।

## টিকটিকি আর খুকু

**নীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত**

টুক্‌টুকে লাল গেঞ্জি পরে
টিকটিকিটা জানলা ধ'রে ঝুলছিল
সেই সময়ে ছোটো খুকু
ছিটকিনিটা ধাক্কা দিয়ে খুলছিল।
দড়াম করে যেই খুলেছে
খুকুর ঘরের সেগুন কাঠের পাল্লাটা
পড়ল খ'সে টিকটিকিটার
লেজেল সঙ্গে লালরঙা আলখাল্লাটা।
বাপরে বলে সেই বেচারা
পড়ল গিয়ে খুকুর ঘাড়েই ধপ করে
ভীষণ রেগে, দাঁত খিঁচিয়ে
ধরল খুকুর নাক ছাবিটা খপ করে।
বলল খুকু দূর হয়ে যা
ন্যাংটাপুটো, দুষ্টু, পাজি, ল্যাজখোলা
মনের দুঃখে টিকটিকিটা
বাংলা ছেড়ে রওনা দিলো রামঝোলা।

## ডাকাডাকি

**সুদীপ্ত বিশ্বাস**

টিকা টিকা টিক টিক
এখন তোরা ভাববি যা যা
সব কিছু তার ঠিক।
হুক্কা হুয়া হুম
শীতের রাতে তোদের কেন
ডাকাডাকির ধুম ?
গ্যাঙর গ্যাঙর গ্যাঙ
ঘরের কোণে কখন এল
মস্ত কোলা ব্যাঙ ?
চিড়িক চিড়িক চিক
লেজটি তুলে কাঠবেড়ালি
ছুট দিয়েছে ঠিক।
কড়াত কড়াত কড়
বাজ পড়েছে, ছুট্টে গিয়ে
মাকে চেপে ধর।

## শরৎ মধুময়

**সৌমিত্র মজুমদার**

শরৎ মানে টুপ টুপা টুপ
শিশির ঝ'রে পড়া,
শরৎ মানে নীল নালাকাশ
সাদা মেঘের ওড়া।
শরৎ মানে পদ্মবনে
খুশির উঁকিঝুঁকি —
শিউলি ঝরা ভোরের উঠান
পুজোর আঁকিবুকি।
শরৎ এলে সদলবলে
এদিক-ওদিক ছোটা,
দিঘির বুকে নাচন দিয়ে
শাপলা শালুক ফোটা।
শরৎ এলে আগমনির
পদধ্বনি আসা,
তাই শরতের প্রতি সবার
অশেষ ভালোবাসা।

## পুজো আসছে
### দীপকচন্দ্র চক্রবর্তী

আনন্দে লাফ দিচ্ছে খুকু, মাটি লেপেছে প্রতিমায়,
বইপত্তর গুটিয়ে রেখে, পড়া ফেলে গান গায়।
বাবা মায়ের কড়া শাসন, রাগ যে তার ধরে মনে,
তাইতো খুকু, মূর্তিগড়া দেখতে থাকে আপনমনে।
পুজোর বাজার জমেছে বেশ, চলছে কেনাকাটা।
বাবা মায়ের সঙ্গে চলে বাজার পানে হাঁটা।
বড়লোকের খোকা-খুকু কাটায় পুজো সুখে
আমাদেরই অভাব নিয়ে কাটবে পুজো দুখে।
তাই বলে কী থাকব ঘরে, পুজোর ক'টা দিন,
দিন আনি দিন খাই তবুও নাচবো তা ধিন ধিন।
বলব মাকে পরের বছর অভাব না আর থাকে,
হেসে খেলে, পড়া ভুলে, প্রণাম জানাই মাকে।

## আমার গ্রাম
### নিতাইচন্দ্র রজক

গ্রামটি আমার সবার সেরা তরুলতায় ঠাসা,
শাখীর শাখায় বিহগেরা শিস দিয়ে যায় খাসা।
হেথায় সুনীল আকাশ তলে সবুজের রাজপাট
কুমুদকমল পুকুরজলে সানবাঁধানো ঘাট।
জলেস্থলে জড়িয়ে আছে আমার পল্লীপ্রীতি
রাঙাধুলোয় ছড়িয়ে আছে কত অতীত স্মৃতি।
দিগ্‌রেখাতে সবুজ সাথে নীল বাঁধে গাঁটছড়া
এ অবোধ মন পড়ায় মাতে পড়ে স্মৃতির পড়া।
ভালোবাসার হাতছানিতে আজও আমায় টানে
সোহাগ সুখে ভরিয়ে দিতে গ্রাম-মা আমার জানে।

## স্কুল ছুট
### প্রদীপ চৌধুরী

স্কুল যাওয়া নিয়ে রোজ রোজ ঝগড়া,
ব্যাগ ফেলে মারি দৌড় বাবা বলে পগড়া।
জোর করে তবু যে মা, নিয়ে যাই ইস্কুলে,
তবু আমি ছুট দিই ইস্কুল-ড্রেস খুলে।
ধর ধর করে সব, পিছে কেউ আসে তেড়ে
চোখ বুজে দৌড় মারি, লেখা আর পড়া ছেড়ে।

## জুতো
### বিষ্ণু সামন্ত

খোকাবাবুর জুতো কোথায় এক পাটি তার নেই,
নিয়ে গেল ভূত এসে কি ? শুধু একটিকেই ?
ভূত নয়রে, ভয় নয়, ভূত কি আবার সত্যি হয় ?
ওই দ্যাখো না পাশের বাড়ির ঘেউ-ঘেউ-ঘেউ ভুতো
মুখে নিয়ে খেলছে কেমন খোকাবাবুর জুতো !

## আজগুবি প্রশ্ন
### সুদীপ চৌধুরী

কালো রঙের কাক নাকি কাকের রং কালো ?
চুরি করে কুকুরে খায় মাছ, নাকি বেড়াল-হুলো।
নীল রঙের আকাশ, নাকি আকাশের রং নীল ?
আকাশে ওড়ে চিল, নাকি আকাশ ওড়ায় চিল ?
কথাবলা-মানুষ নাকি মানুষ কথা বলে,
উত্তর এর বের করবই আমি কথার ছলে।

## হাতির নাচ
### মদন চক্রবর্তী

নাচছে হাতি দুটি পায়ে গাইছে গাধা গান
শিয়াল মামা ঢোলক বাজায় ঘোড়া করে মান।
বাঘ ভাল্লুক সিংহ হরিণ করছে কত মজা
গন্ডার আর জলহস্তি ভোগ করছে সাজা।

## মশা এসেছে
### সুশান্ত তেওয়ারী

সন্ধেবেলা ঠক্ ঠক্ ঠক্ কে এসেছে ?
বাজলে ছ'টা সবাই জানে মশা ঢুকেছে।
সচেতন হলেই তবে
ডেঙ্গি সব রোধ হবে।
বাজার দখল করতে মশা কোমর বেঁধেছে।

# খেজুর বনের স্মৃতি

## তরুণকুমার সরখেল

"এ কটা আস্ত খেজুর-বন এত বছর পরেও কী করে একইরকম ভাবে টিকে থাকে ?" ব্রজদুলু বাবু ভাবতে লাগলেন। চারদিকে বনতুলসী আর শিয়াকুলের কাঁটা ঝোপ জায়গাটাকে ঘিরে রেখেছে। ফলে কিশোরবেলার সেই পুরনো খেজুর বনটাই এখনো অটুট রয়েছে এখানে। কবেকার একটা অতি পরিচিত গন্ধ এখানের বাতাসে মিশে রয়েছে। ভোরবেলা কুয়াশায় মাখামাখি হয়ে যে গন্ধটা বাতাসে নেচে বেড়াত সেই গন্ধটাই ব্রজদুলালবাবু অনুভব করতে লাগলেন। শিয়াকুলের ঝোপ মাড়িয়ে তিনি অনেকটা দুর্ভেদ্য অঞ্চলে ঢুকে পড়েছেন।

এখন সকাল ছ'টা - সাড়ে ছ'টা হবে। শীতের কুয়াশা এখনো পুরো কাটেনি। খেজুর গাছ থেকে শীতল ও মিষ্টি রসভর্তি হাঁড়ি নামিয়ে ফেলা হচ্ছে। সেই খেজুর রসের ঘ্রাণ নাকের ভেতরে প্রবেশ করতেই তিনি এক ধাক্কায় অতীতে ফিরে গেলেন।

"আমার নাম অনাথ বড়াল। থাকি এই মল্লিকপাড়ায়।"

"আরে আমিও তো মল্লিকপাড়ায় থাকি। তোকে তো ওখানে দেখিনি কোনদিন।"

"না, এটা তো আমার মামার বাড়ি। এবার বিজুলীপ্রভা জুনিয়ার স্কুলে ভর্তি হয়েছি। তাই এখান থেকেই পড়াশোনা করতে হবে," অনাথ বলল।

আমি বললাম, "কোন ক্লাসে ভর্তি হয়েছিস ?"

"ক্লাস সেভেনে।"

আমি উৎসাহিত হয়ে বললাম, "আমিও তো ক্লাস সেভেনে উঠেছি। তার মানে আমরা দু'জনে দু'জনের বন্ধু। তাই তো ?"

অনাথ আস্তে করে ঘাড় নাড়ল।

অনাথ আর আমি একেবারে হরিহর আত্মা হয়ে গেলাম। তবে মামাবাড়িতে অনাথের খুব একটা ভালোবাসা জোটে না। যেহেতু মামাবাড়ির অবস্থা তেমন স্বচ্ছল নয় তাই অনাথকে অধিকাংশ দিনই খিদের মধ্যে থাকতে হয়।

সকাল দশটায় ফেন-ভাত আর আলু-মাখা খেয়ে স্কুলের পথে হাঁটে সে। হাঁটতে হাঁটতেই খাবার হজম হয়ে আসে। তাই স্কুল ছুটির পর সে খিদে ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায়না। এদিকে মামা বাড়িতেও বিকেলের দিকে আর কোন টিফিনের ব্যবস্থা থাকেনা। তাই অনাথ খিদে নিয়েই এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়। ও স্বভাবে অনেকটাই লাজুক। এ কারণে আমাদের বাড়িতেও খুব একটা আসে না।

আমরা সময়ে অসময়ে গ্রামের আশে পাশে ঘুরে বেড়াই। ঘুরতে ঘুরতে মাঝে মধ্যেই চলে আসি খেজুর বনে।

গ্রামের পূর্বদিকে বেশ ঘন খেজুর বন। শীতের শুরুতেই পুরো খেজুর বন জমজমাট হয়ে ওঠে। কুমোর পাড়া থেকে নতুন মাটির হাঁড়ি এনে হাজির করে গ্রামবাসীরা। গাছে উঠে খেজুর গাছের উপরের অংশ চেঁছে রস বেরোনোর জায়গা করে। কেউ আবার মাঠের শুকনো ডাল-পাতা এনে এক স্থানে জমা করে। গাছ থেকে রসের হাঁড়ি নামিয়ে ঐ ডাল-পাতা দিয়ে আগুন জ্বেলে উনুনে বেশ করে ফুটিয়ে গুড় তৈরি করে। সেই ফুটন্ত গুড়ের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে খেজুর বনের এপ্রান্ত থেক ওপ্রান্ত। ভোরবেলা মিষ্টি খেজুর রস চুরি করতে আসে কাকের দল!

আমি ও অনাথ খেজুর গাছের নীচে দাঁড়ালেই গ্রামের পরিচিত দাদা-কাকারা হাঁড়ি ভর্তি খেজুর রস গাছ থেকে নামিয়ে দেয়। অনাথের খেজুর রস খুব পছন্দ। তাছাড়া খিদে পেলে সব কিছুই একটু বেশি মিষ্টি লাগে মনে হয়। অনাথ যেহেতু অধিকাংশ সময় খিদে পেটে থাকে তাই সে চোঁ - চোঁ করে ঠান্ডা খেজুর রস মেরে দেয়।

এরপর খেজুর রস খাওয়াটা তার নেশায় পরিণত হল। কাকের দল যেরকম রাত শেষে ভোরবেলা চুপিচুপি খেজুরের হাঁড়িতে ঠোঁট ডোবায়, অনাথও সেরকম করে। কী জানি রাত্রেও ও অধিকাংশ দিন খিদেতেই থাকত কিনা। না হলে ভোর হতে না হতেই ওর এরকম ভয়ানক খিদে পায় কী করে ? ওর যেহেতু এটা মামা-বাড়ি তাই গাছ থেকে হাঁড়ি নামিয়ে রস খেয়ে নিলেও কেউ কিছু বলে না। আসলে এখানে খেজুর গাছের সংখ্যা যেরকম প্রচুর সেরকম রস-ভর্তি হাঁড়ির সংখ্যাও প্রচুর। তাই দু'এক খানা রসের হাঁড়িতে কিছু যায় আসে না তাদের।

ডিসেম্বর মাসে শীত বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে। সকালে ঘুম ভাঙতে ভাঙতেই সাতটা সাড়ে সাতটা বেজে যায়।

একদিন লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছি এমন সময় ভোরবেলা জানালায় কেউ মৃদু টোকা দিল। পর পর তিনবার টোকা দেবার পর জিজ্ঞেস করলাম, "কে ?"

খুব আস্তে করে উত্তর এল, "আমি অনাথ।"

আমি বললাম, "এখনও তো চারদিক অন্ধকার। এত ভোরে উঠে পড়েছিস ?"

অনাথ বলল, "ঘুম ভেঙে গেলে আমি বিছানায় থাকতে পারিনা। তাই চলে এলাম। চ না একবার খেজুর বনটা ঘুরে আসি।"

আমি বললাম, "তুই একটু এগিয়ে দাঁড়া। আমি একটু পরেই আসছি।"

দু'জনে খেজুর বনে পৌঁছাতেই দেখলাম, ঠান্ডায় এত ভোরে কেউই আসেনি।

অনাথ বলল, "ওপাশটায় একটা পাথরের চাতাল আছে ওখানে গিয়ে বসব চল।"

পাথরের চাতালের পাশেই লম্বা একটা খেজুর গাছ। অধিকাংশ খেজুর গাছই এখানে বেশ লম্বা। আর উপরের দিকটা খাঁজ কাটা।

অনাথ সেই লম্বা খেজুর গাছটার দিকে একবার তাকিয়ে বলল, "ব্রজ খেজুর রস খাবি ?"

প্রায় আঁতকে উঠে আমি বললাম, "তুই কি এই লম্বা গাছটায় ওঠবার প্ল্যান করছিস নাকি ? গাছে ওঠা এত সোজা। তাছাড়া গাছে উঠতে গেলে পায়ে দড়ি বেঁধে উঠতে হয় সেটা জানিস না ?"

অনাথ লোভীর মত চকচকে চোখ নিয়ে গাছ পানে চেয়ে রইল। আমি জানি অনাদের খিদে পেয়েছে। তাই সে খেজুর রস পেড়ে খাবার মতলব করছে।

বললাম, "চল অনাথ, বড়িতে গিয়ে চানাচুর মুড়ি খেতে খেতে পড়া মুখস্ত করিগে। এত সকালে বাইরে বেশিক্ষণ থাকলে বাবা রাগারাগি করবে।"

অনাথ চোখের নিমেষে গাছের গুড়ি ধরে উপরে উঠতে লাগল। আমি যত বলি, "অনাথ উঠিস নে উঠিস নে" তত সে দ্রুত উপরে উঠতে লাগল।

"ব্রজ নাকি ?"

হঠাৎ ঘোর কাটল আমার। দেখলাম অচিন্ত্য মাথায় মাঙ্কিক্যাপ বাঁ হাতে মোবাইল আর ডান হাতে লাঠি নিয়ে এদিকেই আসছে।

বললাম, "মর্নিং ওয়াকে নাকি ?"

সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে অচিন্ত্য বলল, "তুই শহর থেকে কবে এসেছিস ?"

"গতকাল সন্ধ্যার বাস ধরে এসেছি।"

"ও বুঝেছি ! চল অনেকদিন পর দু'জনে মিলে চাতালে বসে কথা বলা যাবে।"

মনের মধ্যে অনেক স্মৃতি ভীড় করে আসছে। আমার কষ্টের কথা অচিন্ত্য জানে। চাতালের ঠিক যেখানটায় পড়ে অনাথের মাথাটা থেঁতলে গিয়েছিল সেখানে দু'জন বৃদ্ধ চুপচাপ এসে দাঁড়ালাম। অচিন্ত্য কয়েকটা নাম না জানা মেঠো ফুল নিয়ে এলে দু'জনে তা ছড়িয়ে দিলাম সেই ক্ষুদার্ত পাথরটার বুকে। অচিন্ত্য এই পাথরটার নাম দিয়েছে "ক্ষুদিত পাষাণ"।

ভোরবেলার নিস্তব্ধতায় জ্যান্ত হয়ে উঠল অনাথের স্মৃতি। সেই লম্বা খেজুর গাছটা এখন আর নেই। তবে তার

পাশেই আরো নতুন একটা খেজুর গাছের মাথায় মাটির হাঁড়ি বাঁধা। হাঁড়ির বাইরের ভিজে অংশ দেখেই বোঝা যায় ওটা মিষ্টি খেজুর রসে ভর্তি।

ঠিক তক্ষুণি একটা কাক চুপিচুপি এসে হাঁড়টায় ঠোঁট ডুবিয়ে দিল। তারপর প্রাণভরে মিষ্টি রস খেতে লাগল।

"কাকটার নিশ্চয়ই খুব খিদে পেয়েছিল"। একথাই হয়ত আমরা দু'জনে বলতে চাইছিলাম। কিন্তু কেউ কোন কথা বললাম না। চুপচাপ বসে দেখতে লাগলাম সেই তৃষ্ণার্ত কাকটাকে!

## দুটি ছড়া

**মানস দরিপা**

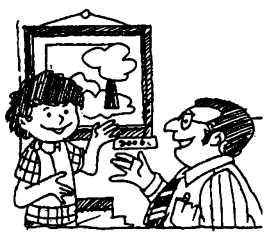

(১)
খোকা যেদিন আঁকে ছবি
জল ও তুলি দিয়ে
হাজার টাকায় বিকোয় সেটা
কলকাতাতে গিয়ে।

(২)
শেয়াল পণ্ডিত মন্ত্র পড়ে
কালো কাকের বিয়ে,
নাচতে থাকে হাতি-ঘোড়া
টোপর মাথায় দিয়ে।

## অঙ্কের ভূত

**তরুণকুমার সরখেল**
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
অবি সরকার
দাম ঃ ৫০ টাকা।

### মজা রাশি-রাশি

ক্লাস সেভেনের মতিরামের অঙ্কে বড় ভয়। প্রায়ই তাকে হেনস্থা হতে হয় 'অঙ্কের জাহাজ' বিপদতারণস্যারের হাতে। একদিন মতি এমন বুদ্ধি বরে করল, যাতে সহজ করে অঙ্ক শেখানোর সংকল্প নিতে বাধ্য হলেন বিপদতারণস্যার। এদিকে ডিসেম্বরের হাড়কাঁপানি শীতে মুচকুন্দপুর গ্রামে রুগি দেখতে গিয়ে ঠাকুরদা পড়লেন রকমারি ভূতের পাল্লায়। ছেলেধরা ভেবে বাঁশিবাজানো যাদুকরকে মেরে আধমরা করে দিল গ্রামের লোক। জুতো চুরি গেল ভূতোমামার। রহস্যের সমাধান হল সোনার কলমের। কথা বলা ময়না পাখির জন্য সুমনের মন খারাপ করল। এত সব ঘটনা নিয়েই তরুণকুমার সরখেল লিখে ফেললেন মজার একটি বই অঙ্কের ভূত।

**আনন্দমেলা**
২০ শে এপ্রিল ২০১৪

তরুণকুমার সরখেল ছোটদের মন বোঝেন ভালোই। গ্রামবাংলার প্রকৃতি, স্কুল জীবনের ছবি, মাঠ থেকে ইঁদুরের ধান বের করার কৌশল ইত্যাদি নিয়ে মোট ২৬ টি গল্প আছে বইটিতে। 'অঙ্কের ভূত', 'ঘুম নেই হরিমোহনবাবুর', 'ঠাকুরদার রকমারি ভূত', 'দুখিরাম'-এর মতো গল্পগুলি পাঠককে আনন্দ দেবে। গোয়েন্দা কাহিনি, সায়েন্স ফিকশন আর রহস্যগল্পও আছে।

**সাপ্তাহিক বর্তমান**
২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৫

## তরুণকুমার সরখেলের ছোটদের বই

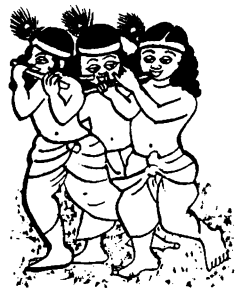

* মজার মেরিক
* ভূতোমামার জুতো
* এক পকেট লিমেরিক
* মেজমামার ছাতা
* হাতি দাদার সাঁকো
* সাঁতরাগাছির সতুমামা
* ছড়ার ঢাক দিচ্ছে ডাক
* ভূতের ঘরে ভুতো
* আড়িয়াদহের পুড়িয়াবাবা
* লিমেরিক জিন্দাবাদ

* প্রজাপতির দেশে
* পুরুলিয়া মেরিক
* নীল ঘুড়ি
* ছত্রিশ মেরিক
* হলুদফুলের হাসি
* সোনারুপোর চাঁদ
* তাইরে নাইরে নাই
* উদভট্টম্
* সেঞ্চুরি মেরিক
* ইচ্ছে করে

* তরুণের ছড়া
* ব্যাঙের পাঠশালা
* শিবু আংকেল
* এক পকেট ভূত
* লেজকাটা শেয়াল
* ছোটদের গল্প
* অঙ্কের ভূত
* একটি কিশোর একা
* ম্যাজিক ছাতা
* এক ডজন গল্প
* এক ডজন হাসির গল্প

## অনিক-বানিকের ছড়া

**নূপুর সরখেল**

এই ছড়াটি দুষ্টু-মিষ্টি দাদা এবং ভাইয়ের
এই ছড়াটি এই ছিল আর অমনি হঠাৎ নাইয়ের।
কোথায় গেল অনিক বানিক , ভিজছে নাকি বাইরে ?
মা হাঁক দেয়, দুধ খেয়ে নে, একটু দাঁড়া, যাইরে।
দাদা গেছে ঐ যে দূরে ঝাপুড়-ঝুপুড় গাছটায়
রোজই তো সে ঘুরপাক খায় ঠিক বিকেলে পাঁচটায়।
ভাই এখনো ছোট কিনা, ছাদের কোণেই খেলছে,
টবের ফাঁকে দেখছে পাখি, ক্যামনে পাখা মেলছে।
আবার যখন দুষ্টু-মিষ্টি একসাথে ফের জুটবে।
মোটু-পাতলু দেখতে আগে রিমোট নিয়ে ছুটবে।
ঠাম্মা-দাদুর বন্ধ দেখা সিরিয়ালের শেষটা,
আর পাবে না রিমোট হাতে, যতই করুক চেষ্টা।


পুরুলিয়া শহর থেকে প্রকাশিত একমাত্র
ছোটদের পত্রিকা সঞ্চিতা-র চলার পথ
আরো মসৃণ হোক

# ছকু সহিস

আশু সহিস লেন
দেশবন্ধু রোড, পুরুলিয়া শহর

# ছোটদের বই

## আরাত্রিক

**স্মৃতিকণা মুখোপাধ্যায়**
**প্রকাশক ঃ ক্যানভাস**
**২/৩ সত্যপ্রিয় রায় সরণী, লেকটাউন, শিলিগুড়ি।**
প্রচ্ছদ ঃসম্রাট দেব।

মূল্য ঃ ৭০ টাকা।

তিনিটি শিশুমনের কীর্তি কাহিনি এই গল্পে বিবৃত হয়েছে। লেখিকা কথার মত কথা-য় বলেছেন, উপন্যাসের আকারে লেখা এই কাহিনিতে একটি সত্যের বীজ লুকানো আছে। যা চিরন্তন সত্য।

বইটির পর্ব সূচিতে রয়েছে তিনটি পর্ব, কচি, কোমল ও কঠিন। ভাবনাটি চমৎকার। কচি ও কোমল পর্ব দুটিই সিংহভাগ পৃষ্টা দখল করেছে।

কঠিন পর্বে রয়েছে মাত্র আড়াই পৃষ্টার কথা। লেখিকার গল্প বলার ধরনটি ভালো। বইটি পড়তে শুরু করলে শেষ না করে ওঠা যায় না। সবচেয়ে আকর্ষণীয় হয়েছে বইটির প্রচ্ছদ। আরাত্রিকের বহুল প্রচার কামনা করি।

## রাঙা মাথায় চিরুনি

**বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায়**
**প্রকাশক ঃ সঞ্চিতা, আমডিহা, ডাক- দুলমি-নডিহা, পুরুলিয়া- ৭২৩১০২।**
মূল্য ঃ ৩০ টাকা।

কবি-গল্পকার ও ছড়াকার বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায়ের এই চমৎকার ছড়ার বইটি হাতে নিলেই বোঝা যাবে তিনি কত সুন্দর সুন্দর ছড়া-কবিতা পাঠকের উপহার দিয়েছেন। ছুমন্তর, জয় বাবা কেরিয়ার, নাম কী তোর বার বার পড়তে ইচ্ছে যায়। ভোর এসেছে, সেই ছেলেটি, দাও বাড়িয়ে হাতখানা ছোট বড় সকলেরই ভালো লাগবে। দুর্দান্ত বিষয়ভাবনা আর ছন্দের কারুকার্যের মোড়কে ঢাকা রাঙা মাথায় চিরুনির ছড়া কবিতাগুলি হয়ে উঠেছে জমজমাট। ধীমান পালের প্রচ্ছদ আর অলংকরণ মানানসই।

## অল্পস্বল্প মজার গল্প

**সুচিত চক্রবর্তী**
**ভোলানাথ প্রকাশনী, ৩৭/১১ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা -৯।**
মূল্য ঃ ৬০ টাকা।

ছড়া - কবিতা-গল্প লেখেন, বলছি শোনো লেখেন কী আর, বাংলা ছবির চিত্রনাট্যকার, গল্পকার এবং গীতিকার। বইটির লেখক সুচিত চক্রবর্তীর সম্যক পরিচিতি পাওয়া যাবে ভবানীপ্রসাদ মজুমদারের লেখা ভূমিকা থেকে।

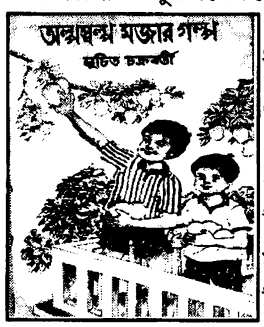


বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত উনত্রিশটি ছোট ছোট শিশুতোষ লেখা নিয়ে এই অল্পস্বল্প মজার গল্প। বেশ কিছু মজার গল্প পাঠকদের নির্ভেজাল আনন্দ দিতে সক্ষম। ভালো লাগল- সবাই বলে পড়ো, মা-শালিক ও মিনি বিড়াল, পান্তাবুড়ি প্রভৃতি।

## খেলনা গাড়ির ভোঁ

**সোমনাথ ভট্টাচার্য**
**সুমুদ্রণ, ৫২৮, এম বি রোড, কলকাতা-৫১।**
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ঃ দীপঙ্কর দে।
মূল্য ঃ ৫০ টাকা।

এই ছিল নীল আকাশ জুড়ে/এই কালো তার মুখখানা / হাসবে কখন, কাঁদবে কখন/ কিছুই কী তার যায় জানা ?/ একটু আগেও চোখরাঙানো / সূর্য ছিল আকাশটায়।/ এখন এমন মেঘ ঘিরেছে,/ অসাধ্যি তার পাশ কাটায়। আকাশলিপি শিরোনামের এই ছড়াটি উল্লেখ না করে পারলাম না।

এরকম ভালো লাগার ছড়া কবিতা রয়েছে খেলনা গাড়ির ভোঁ-র পাতায় পাতায়। প্রচ্ছদের প্রথম পৃষ্টার ও চতুর্থ পৃষ্টার দুটি ছবিই মানানসই হয়েছে। প্রতিটি লেখার সঙ্গে রয়েছে শ্রী দীপঙ্কর দের অলংকরণ। বইটি সকলের কাছে সমাদৃত হোক এই কামনা করি।

# ছোটদের বই

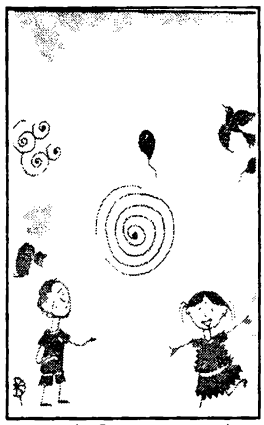



## ইচিন বিচিন

**মালিপাখি**
প্রকাশক ঃ ছোটদের নীল আকাশ
**ধুবুলিয়া, নদিয়া।**
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ঃ
সুভাষ মুখোপাধ্যায়।
মূল্য ঃ ৩৫ টাকা।

স্মৃতির শেতলপাটি খ্যাত মালিপাখির এই ইচিন বিচিন ছড়ার বইটিতে রয়েছে উনত্রিশটি ছড়া-কবিতা। চমৎকার ছন্দের মোড়কে আবৃত ছড়াগুলি বার বার পড়তে ইচ্ছে যাবে। বইটির ভূমিকা লিখতে গিয়ে শ্রদ্ধেয় পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন- গদাধর ভালো লেখেন জানতাম। তিনি যে এত ভালো লেখেন জানতাম না। চমৎকার সব ছড়া, দেশজ ছড়ার গন্ধ ছড়ানো। সেই সুর, সেই লয়, ছড়ায় ছড়ায় লোকায়ত আবহ। তাঁর মতে নিরবিচ্ছিন্নভাবে ভালো লেখা লিখে যাওয়া সহজ কাজ নয়। সেই কাজটিই করে চলেছেন মালিপাখি। বিশেষভাবে ছোটদের ভালো লাগবে - ইচিন বিচিন, ইড়িং-বিড়িং, হাঁদু-ফাঁদু, হাসি-খুশি প্রভৃতি।




## একটু একটু গা ছমছম

**সম্পাদনাঃ**
**শুভজিৎ বরকন্দাজ**
**পানকৌড়ি, হৃদয়পুর,**
**কলকাতা-১২৭**

মূল্য ঃ ১৫০ টাকা।

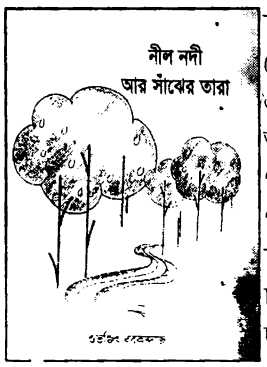

দ'ডজনের অধিক চমৎকার ভূতের গল্প নিয়ে হাজির একটু একটু গা ছমছম। এই সময়ের জনপ্রিয় গল্পকারদের লেখনীতে ভয় ধরানো ভূতের গল্পগুলি সম্পাদক মহাশয় যত্ন নিয়ে এক মলাটের নীচে হাজির করেছেন। ছাপা, কাগজ, মলাট ও প্রচ্ছদ সব মিলিয়ে ভূতের বই জমজমাট। লিখেছেন অনন্যা দাশ, দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য, শিশির বিশ্বাস, সাগরিকা রায় আনসার উল হক, শুভজিৎ বরকন্দাজ প্রমুখ।

## নীল নদী আর সাঁঝের তারা

**শুভজিৎ বরকন্দাজ**
**পানকৌড়ি, হৃদয়পুর,**
**কলকাতা-১২৭**
প্রচ্ছদ ঃ শুভ্রনীল।
অলংকরণ ঃ প্রতিম দাস
মূল্য ঃ ৫০ টাকা।




২৪ টি মন ভোলানো হৃদয় দোলানো কবিতা নিয়ে কাবের এই নীল নদী আর সাঁঝের তারা। সবচেয়ে ভালো লাগল গাঁয়ের বাড়ি কবিতাটি। এছাড়া গাঁয়ের পথে, জলছবিরা, মজার ছুটি, স্বপ্ন-ঘর কবিতাগুলিও চমৎকার। পাতায় পাতায় প্রতিম দাসের আঁকাগুলি মানানসই।

## বারোটায় বারোটা বাজল

**মনোরঞ্জন গরাই**
**রেনেসাঁ প্রকাশন**
**বাগনান, হাওড়া - ৭১১৩০৩।**
প্রচ্ছদ ভাবনা ঃ সুবোধ বারই, প্রচ্ছদের ছবিঃ প্রণব হোড়।
মূল্য ঃ ১০০ টাকা।

বারোটায় বারোটা বাজল গল্পগ্রন্থটিতে রয়েছে শিশু-কিশোর উপযোগী আঠারোটি গল্প। গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন তরুণকুমার সরখেল। আলোচ্য গ্রন্থটিতে বেশ কিছু নিটোল ও বিষয় বৈচিত্র্যে ভরপুর গল্পের সন্ধান মেলে। কন্ঠিরামের কথা, স্মৃতি, পলাশবনী, নির্ঝর, প্রতিদান গল্পগুলি ভালো লাগল। সবচেয়ে মজার গল্প বারোটায় বারোটা বাজল। মৌমাছির কামড় খেয়ে পুলিশ অফিসারের যা হাল হল তা এই গল্পে পাওয়া যাবে।

*—মুক্তা সরখেল*

রণে বনে জলে জঙ্গলে যখনই বিপদে পড়িবে
আমাকে স্মরণ করিও, আমি রক্ষা করিব।

M : 9475324474
8670037151

**BABALOKENATH COMPUTER & OFFSET PRINTING MATH**

All type of Offset Printing and Digital Printing job done here.

Prop. : Rajesh Rewani

MUNICIPALITY COMPLEX, ROOM NO. A-13, 1ST FLOOR
B.T. SARKAR ROAD, PURULIA 723101